বিনিময় : ১৫ টাকা

অধিকার

মে ২০২৩

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- মে দিবসের প্রাক্কালে শ্রমিকের অবস্থা / পৃ. ৩
- আর কতটা মরলে পরে জাগবে তুমি বল ! / পৃ. ৮
- শ্রমজীবী মেয়েদের কথা / পৃ. ১০
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য / পৃ. ১২
- শিক্ষার অধিকার ও আজকের জাতীয় শিক্ষানীতি / পৃ. ১৫
- শহীদ ফাদার ষ্ট্যান স্বামী... / পৃ. ১৬
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১৮-২২
- রিপোর্ট / পৃ.২৩-২৮ ও ২

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

শ্রমিকের অধিকার মানবাধিকার

১লা মে। মে দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার হে-মার্কেটে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ ও জীবনধারণের মান উন্নয়নের দাবিতে অবস্থানরত শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় রাস্ট্রীয় বাহিনী। বহু শ্রমিককে হত্যা করা হয়। কিন্তু না-ছোড় আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত দাবি আদায় হয়। শুরু হয় ৮ ঘন্টার শ্রম দিবস। হে-মার্কেটের সেই শ্রমিকদের লড়াই ও আত্মত্যাগকে স্মরণ করে ১৮৯১ থেকে আজও পৃথিবীজুড়ে পালিত হয় মে-দিবস। নতুন করে শপথ নেওয়া হয় শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার। স্মরণ করা হয় শত-শহীদকে। সহমর্মীতা জানানো হয় অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য সারা বিশ্বের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের লড়াইকে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও)-র প্রতিষ্ঠা অধিবেশনের প্রথম গৃহিত প্রস্তাবই ছিল ৮ ঘন্টার শ্রম দিবস। অথচ এদেশে আজ নানা ছল-বলে শুধু ভরপোষণ ও পরিবার প্রতিপালনের জন্যই ১৮ ঘন্টা শ্রম করতে হয়।

ভারতের সংবিধানের ৪২ নম্বর এবং ৪৩ নম্বর ধারায় সুস্পষ্টভাবে শ্রমিকের অধিকারের কথা বলা আছে। ৪২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে কাজের ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলী, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অবসরের ব্যবস্থা করার কথা। ৪৩ ধারা বলেছে কৃষি শ্রমিক বা শিল্প শ্রমিক বা অন্য যেকোনো শ্রমিকের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত মজুরি দেওয়ার কথা। কর্মস্থলের উপযুক্ত পরিবেশ ও জীবন ধারণের মান রক্ষার কথা। অবসর সময় এবং সামাজিক জীবনে যাতে আনন্দে থাকতে পারে তাও নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকে। সংবিধানের ২৩ নম্বর ধারায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে বেগার খাটানো। ৩৮ নম্বর ধারায় বলা আছে অসাম্য তৈরি না করার কথা। জীবন জীবিকা সম্পদের এমন কেন্দ্রীভবন না করা যাতে সমাজে অসাম্য তৈরি হয়। ৩৯ নং ধারায় বলা আছে নারী পুরুষের সমান অধিকার ও সমকাজে সমবেতন দেওয়ার বাধ্যতার কথা।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শ্রমিকরা তাদের স্বার্থ রক্ষায় একের পর এক আইন আদায় করে নিতে পেরেছিল। শ্রমবিরোধ আইন, স্ট্যান্ডিং অর্ডার আইন, মজুরি আইন, গ্রাচুইটি আইন, বোনাস আইন প্রভৃতি। ষাটের দশকের

শেষ পর্যন্ত এই ধারা চলে। এর পর শুরু হয় বিপরীত যাত্রা। ১৯৭০ সালের ঠিকা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও অবলুপ্তি আইনকেই মোটামুটি শ্রমিকদের পক্ষে শেষ গুরুত্বপূর্ণ আইন বলে মনে করেন অনেক শ্রমিক নেতাই। এরপরও শ্রমিকরা বিরাট বিরাট লড়াই করেছে। ১৯৭৪ এর রেল ধর্মঘট, ১৯৮২ সালের মুম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, সিঙ্গারেনী কয়লা খনির শ্রমিকদের লড়াই - ধর্মঘট। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এসব। কিন্তু এত বড়-বড় লড়াই উল্টোযাত্রাকে ঠেকাতে পারেনি। ২০১১-১২ সালে ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ এবং ইউনিয়নের স্বীকৃতির দাবিতে মারুতি শ্রমিকরা ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তুলে এনেছিল নতুন দাবি। মালিক ও রাস্ট্রশক্তির মিলিত ভয়ংকর আক্রমণ ভেঙে দেয় সে আন্দোলন। আজ এদেশের ৮৩ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ৯২.৪ শতাংশ 'ইনফরমাল' ক্ষেত্রে কাজ করেন অর্থাৎ যাদের চাকরির লিখিত নিয়োগপত্র বা শর্তাবলী নেই।

৪৩ টি শ্রমআইনকে বাতিল করে চারটে কোডের মধ্যে নিয়ে এসেছে আর এস এস - বিজেপি পরিচালিত ভারত সরকার। কোন বৃহৎ রাজনৈতিক দল এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে আন্তরিক নয়। ইলেকটোরাল বন্ডের টাকা নিয়ে কর্পোরেটের বিরুদ্ধে বা কর্পোরেট পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভবও নয়। কিন্তু বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হলেও এর বিরুদ্ধেও লড়াই করছে শ্রমিকরা। তাই আজও শ্রমকোড সারাদেশে পুরোপুরি লাগু করতে পারেনি। শ্রমিকদের অধিকার হীনতাই শ্রমকোডের মূলকথা। হায়ার এন্ড ফায়ারই মূলনীতি। সেটাকে আড়াল করার জন্য কিছু পোশাক পরানো। মে দিবসের মূলনীতি ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম এবং ৮ ঘন্টা আমোদ প্রমোদ। এসব ধারণার মূলেই কুঠারাঘাত করছে শ্রমকোড। এমন-কী আমাদের সংবিধানে বর্ণিত শ্রমিকদের অধিকারের ধারণাগুলোই আজ আক্রান্ত। কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এতদিন কাগজে কলমে মানত। এখন সরাসরি অস্বীকার। তাই অধিকার কর্মীদেরও আজ শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হতে হবে। ওদের বিশ্বায়ন আজ সবাইকেই এক লাইনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অধিকারহীন সমাজে তাই ভাগাভাগির সুযোগ নেই। সবার অধিকারই আক্রান্ত। তাই মে-দিবস ডাক দিচ্ছে ব্যাপক ঐক্যের। অধিকারহীন মানুষের ব্যাপক ঐক্যই সময়ের ডাক। মে দিবসের ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে আমাদেরও বলতে হবে শ্রমিকের অধিকার মানবাধিকার।

রিপোর্ট– ২৮ পাতার পর—

লুকিয়ে রাখে। দেশের ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা ঋণ খেলাপি করে বিদেশে পালায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারি মদতে। আর সংযোজন, সংশোধন এর নামে সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা লুঠ করছে।

আধার কার্ড তৈরির সময় কেন্দ্র বলেছিল এটা দেশে অধিবাসের পরিচিতি পত্র, নাগরিক পরিচয়পত্র নয়। নাগরিক পরিচয়ের প্রমাণ হল ভোটার কার্ড অথবা পাসপোর্ট। অথচ আধার কার্ড ব্যবহার হল নাগরিক পরিচয় পত্রের মত। সাধারণ মোবাইল কনেকশন থেকে পাসপোর্ট পাওয়া অবধি। পরবর্তী কালে CAA NRC NPR আনার সময় বলা হলো আধার তো নয়ই, ভোটার এবং পাসপোর্ট কোনটাই নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, অন্য পরিচিতি পত্র আনা হবে। কখনো সুষ্ঠ পরিসেবার নামে রেশন কার্ডের সাথে আধার লিঙ্ক করে শুধুমাত্র ঝাড়খন্ডে বাদ দেওয়া হল এক কোটি দশ লক্ষের বেশী অতি দরিদ্র মানুষের নাম। গ্যাসের ভর্তুকি, MGNREGA স্কীমে কাজের পারিশ্রমিক সুষ্ঠ বিতরণে জন্য অথবা অন্যান্য সমাজকল্যাণের প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করানো হল আধার, যদিও আধার সংস্থায় জমা করা তথ্যের নিরাপত্তা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ওই দিন পথসভায় বক্তব্য রাখেন APDR-এর সাথী সঞ্জীব আচার্য, সোমনাথ বসু, নিশা বিশ্বাস, মোহিত রনদীপ, No Nrc Movement এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অরুপ মজুমদার প্রমুখ। সভায় উপস্থিত ছিলেন APDR-এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর। শাখার পক্ষ থেকে ওই দিন পরিস্কার জানানো হয় আমরা বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। আধার কার্ড প্যান কার্ড সংযোজন বাধ্যতামূলক করার বিরোধিতা করছি। কারন আমরা সাধারণ মানুষের এ হেন হয়রানির বিরোধিতা করছি। বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। হরেক কার্ড নয়, নয় লিঙ্কিং এর নামে হয়রানি। ফেরত দিতে হবে লুঠ করা সব টাকা।

রিপোর্ট— পূর্ব কলকাতা

২৩ এপ্রিল, '২৩ পূর্ব কলকাত শাখার বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক অমিতাভ সাহা প্রতিবেদন পেশ করেন। দীর্ঘ দিনের শাখা। এই শাখায় সদস্য সংখ্যা অতীতে বেশ ভাল থাকলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা কম।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, বি সি রায় হাসপাতালে শিশু মৃত্যু নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা, 'বিদুষক' নাট্য গোষ্ঠীর নাটক বন্ধ করে দেওয়া এবং প্রহৃত নাট্যকারের পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ গড়ে তোলার কথা। রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির জন্য শাখার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রের সন্ত্রাস, অধিকারহরণের বিভিন্ন ঘটনায় শাখা পথসভা করে। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জয়শ্রী সরকার।

মে দিবসের প্রাক্কালে শ্রমিকের অবস্থা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

১৯৪৮ সালে যখন ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট তৈরি হয়, তার মুখবন্ধে লেখা হয়েছিল, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে এইআইন তৈরি করা হচ্ছে। পরবর্তী কালে অন্য যে সকল আইন তৈরি হয়, সেগুলোতেও কাগজে কলমে অন্ততপক্ষে শ্রমিক স্বার্থ, শ্রমিক অধিকারের অঙ্গীকার রাখা ছিল। আসলে এই আইনগুলো কোনও টাই শাসকশ্রেণী শ্রমিকদের ভালোবেসে বা তাদের প্রতিদরদের জায়গা থেকে তৈরি করে নি। শ্রমিক আন্দোলনের চাপ, জনগণের লড়াই এই আইন প্রণয়নের পিছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিল। তবে শাসকরা চিরকাল তাদের জাতভাই মালিকদের স্বার্থটাই দেখে এসেছে এবং শ্রমিক শোষণ ও শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনার দিকে চোখবুজে থেকেছে। যত সময় গেছে, শাসকশ্রেণীর দলগুলো ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে শ্রমিকদের তারা বেঁধে ফেলতে এবং ভাগ বাটোয়ারা করে ফেলতে পেরেছে। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ লড়াইয়ের ঝাঁঝকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পেরেছে এবং সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্রমিক শোষণের রাস্তাকে আরও মসৃণ করেছে।

খাতায় কলমেও শ্রমিকদের কিছু অধিকার বা আইনি সুরক্ষা থাকুক, এটা দীর্ঘদিন ধরেই শাসকদের মনপসন্দ নয়। ১৯৭৮ সালে মোরারজি দেশাই এর আমলে একবার এবং ১৯৯৯ সালে বাজপেয়ী সরকারের সময় আরও একবার চেষ্টা হয়েছিল শ্রম আইনগুলোকে পরিবর্তন করার। কিন্তু সেই সময় তাদের লক্ষ্য সফল না হলেও, ২০১৪ সাল থেকে পুনরায় শ্রম আইন পরিবর্তন এর চেষ্টা চলতে থাকে। এবার খোলাখুলি ভাবে, পরিষ্কার করে বলা হয় যে এই শ্রম আইন পরিবর্তনের লক্ষ্য হল ব্যবসায়ীরা যাতে সহজে ব্যবসা করতে পারে (Ease of Doing Business)। ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার তত্ত্বাবধানে একটা Business Reforms Action Plan (BRAP) তৈরি করা হয়। এতে বলা হল, পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য বিধিনিষেধকে শিথিল করতে হবে। পরিবেশগত বিভিন্ন সুরক্ষা বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব থেকে মালিকদের মুক্ত করা হল। এর ফলে সরাসরি প্রভাব পড়বে শ্রমিকদের জীবন ও কর্মস্থল এর অবস্থার ওপর। মালিকরা শ্রম আইন ঠিক মতো মানছে কী-না, তার জন্য সশরীরে কারখানা পরিদর্শনের নিয়মতুলে দেওয়া হল। পরিবর্তে মালিকরা এখন নিজেরাই সার্টিফিকেট দেবে যে কারখানায় সব শ্রম আইন ঠিক মত পালন হচ্ছে। ফ্যাক্টরি লাইসেন্স ১০ বছরের জন্য অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করা হল, পুনর্নবীকরণ এর ব্যবস্থাও অনলাইনে চালু হল। কন্ট্রাকটরদের ঠিকা শ্রমিক নিযুক্ত করার লাইসেন্স দেওয়াও চালু হল অনলাইনে। মালিক বা কনট্রাকটররা শ্রম আইন মানছে কী-মানছে না সেটা আর বিবেচ্য বিষয় রইল না। এই সকল সংস্কারের ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাংকের Doing Business সূচকে ভারতের স্থান ২০১৪ সালে ১৪৩ থেকে উন্নতি হয়ে ২০১৯-২০ সালে ৬৩ তে এসে দাঁড়াল।

এর পরবর্তী ধাপে কোভিড ও লকডাউনকে কাজে লাগিয়ে শ্রম ও শিল্প সংক্রান্ত ২৯ টি আইনকে পরিবর্তন করে চারটি লেবার কোড এর মধ্যে শ্রমিক সংক্রান্ত সমস্ত আইনকে কেন্দ্রীভূত করা হল। The Code on Wages ২০১৯ সালের সংসদের বাদল অধিবেশনে পাশ হয়ে যায়। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে বাকি তিনটি কোড ১) The Industrial Relations Code, 2) The Code on Social Security, 3) The Occupational Health, Safety and Working Conditions Code সংসদে পাশ করানো হয়। প্রথম লকডাউনের পরে ব্যবসা ও বাণিজ্যকে সাহায্য করার নামে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার উৎপাদন পুনরায় শুরু করা এবং মালিকরা যাতে পর্যাপ্ত মুনাফা করতে পারে, তার জন্য সাময়িক ভাবে শ্রমিকদের চলতি বিভিন্ন আইনি সুরক্ষাকে স্থগিত করে দেয়। এবং শ্রমিকদের অধিকারকে সঙ্কুচিত করে। শ্রমিকদের অধিকার এর ওপর সেই সকল বিধিনিষেধ এখনও অনেকটাই বলবৎ আছে। আমাদের রাজ্যেও জুট, চা সহ প্রায় কোন শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের লকডাউনের পূর্বের সময়কার মজুরি দেয় নি। এই বিষয়ে সরকার মালিকদের বাধ্য করবার জন্য কোন পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করে।

বর্তমানে শ্রমিকদের অবস্থা

১) কাজের সময় এবং কাজের চাপ অনেক বেড়েছেঃ অনেক সেক্টরেই ১২ ঘন্টা কাজের শিফট চলছে। কোথাও কোথাও সেটা ১৪ ঘন্টা অবধি বাড়ছে। পোষাক শিল্প, জরি শিল্প, গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা, মোবাইল ফোন তৈরীর কারখানাগুলোতে এই ছবি দেখা যায়। ধূলাগড় শিল্পাঞ্চলের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, বীরশিবপুর, জঙ্গলপুরে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, গোদরেজের ওয়ারহাউজগুলিতে ১২ ঘন্টার শিফটে কাজ চলে। গুরগাঁও এর উদ্যোগ বিহার গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং হাব, মারুতি গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা এস পি এম

অটোকম্প এও একই চিত্র দেখা যায়। ভিভো মোবাইল তৈরির কারখানায় প্রত্যেকশ্রমিককে মাসে ৩০ দিনই কাজ করতে হয় এবং প্রতি ঘন্টায় ১৬০ টা ফোন অ্যাসেম্বলিং না করতে পারলে শ্রমিকদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। জুট মিলের শ্রমিকদের প্রোডাকশন মিটার ম্যানেজমেন্ট প্রায় রোজই বাড়াচ্ছে। কোনো শ্রমিক সেই প্রোডাকশন মিটারের সাথে তাল রেখে উৎপাদন না-করতে পারলে, তার রোজ কাটা যায়। ধূলাগড়ে যারা সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে, তাদের নাইট শিফট থেকে ডে শিফটে ডিউটি পরিবর্তনের দিন টানা ২৪ ঘন্টা ডিউটি করতে হয়। যে দিন তারা ছুটি করে, সেই দিনের বেতন কাটা যায়। আইসার (কলকাতা) ঠিকা কর্মচারীরা মাসে ২৬ দিনের বেতন পান, সপ্তাহে একদিন করে তাদের বিশ্রাম থাকে, সেই দিনের বেতন তাদের দেওয়া হয় না। বছরে মাত্র তিন দিন তারা সবেতন ছুটি পান, ২৬ শে জানুয়ারি, ১৫ ই আগস্ট এবং ২ রা অক্টোবর। জুট মিলগুলোতে ছুটির দিনের বেতন (১ লা মে, ঈদ, ১৫ ই আগস্ট ইত্যাদি) পাওয়ার শর্ত হিসেবে ছুটির আগের দিন এবং ছুটির পরের দিন কাজ করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

২) অন্যায্য মজুরি ও বাধ্যতামূলক ওভারটাইম চলছেঃ মোটরসাইকেল এর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা, ওম্যাক্স অটোতে শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি দাবি করায় তাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। গুরগাঁও এর মতো জায়গায় পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের গড় মাসিক মজুরি ৮৮০০ টাকা। ভিভো কারখানার শ্রমিকদের গড় মজুরি মাসে ৯২০০ টাকা (পি এফ কেটে তারা ৭১০০ টাকা হাতে পায়)। ধূলাগড়ে সিকিউরিটি গার্ড এর কাজে দৈনিক গড় বেতন ৩৫০ টাকা। বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়ায় বড় বড় কোম্পানি গুলোর ওয়্যারহাউজে শ্রমিকদের দৈনিক ৩০০-৩৫০ টাকা মজুরি দেওয়া হয়। চা বাগানের শ্রমিকদের এখনও ২০২ টাকা মজুরিতে কাজ করানো হচ্ছে। জুট মিলগুলোতে যারা লার্নার হিসেবে ঢোকেন তারা মজুরি পান দৈনিক ১০০ টাকা। ভাউচার ও ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। বিভিন্ন কারখানাতেই বিনা অতিরিক্ত মজুরিতে বাধ্যতামূলক ওভারটাইম করানো হয়। ওভারটাইম এর জন্য বাধ্যতামূলক দ্বিগুণ মজুরি এখন আর কোথাওই দেওয়া হয় না। জুটমিলের শ্রমিকদের অফ ডে তে কাজ করিয়ে হাতে ৫০০ টাকা নগদে গুঁজে দেওয়া হয়, যেখানে দ্বিগুণ মজুরির হিসাবে একজন মিলহ্যান্ডস শ্রমিকের ওভারটাইমের জন্য ৮৫০-৯৫০ টাকা মজুরি পাবার কথা।

৩) প্রায় সব জায়গাতেই সব কাজ ঠিকা প্রথায় করানো হচ্ছেঃ জুটমিল গুলোতে পার্মানেন্ট শ্রমিক বিষয়টাই প্রায় উঠে গেছে। পিউডিআর এর রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে মোবাইল ফোন অ্যাসেম্বলিং ইউনিটগুলোতে (ভিভো বা হাইপ্যাড) সমস্ত শ্রমিকদেরকে ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। উদ্যোগ বিহার গার্মেন্টিস ম্যানুফ্যাকচারিং হাবের ৯৫-৯৯ শতাংশ শ্রমিক ঠিকায় নিযুক্ত। এল জি ইলেকট্রনিক্স এর ২০০০ জন শ্রমিকের মধ্যে ১১৫০ জন কনট্রাকচুয়াল। আইসার (কলকাতা)য় সিকিউরিটি, গার্ডেনিং, হাউসকিপিং, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল সমস্ত বিভাগ চালানো হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের দিয়ে। কল্যাণী এইএমস-এ যত নিয়োগ হচ্ছে তার ৯০ শতাংশ চুক্তিভিত্তিক। বস্তুত গোটা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মোট শ্রমিক সংখ্যার ৯৫ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত এবং তারা প্রায় সবাই কনট্রাকচুয়াল। এই ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশ গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এসে বা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করছেন। তারা তাদের পরিবারকে সাথে নিয়ে যেতে পারেন না। একটা ঘুপচি ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনেকজনের সাথে রুম শেয়ার করে তাদের থাকতে হয়। অনেক সময় ঘর ভাড়া ও গাড়ি ভাড়া বাঁচানোর জন্য তারা কারখানার মধ্যেই কোন এক কোণে পড়ে থাকেন। মালিক দয়া করে তাদের কারখানার মধ্যে থাকতে দিচ্ছে, এই জায়গা থেকে মালিকের ওপর তাদের নির্ভরতা প্রচন্ড। ফলে মজুরি কম দিলে, কাজের চাপ ক্রমশ বাড়ালে বা কারখানায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন আইন কানুন মালিক না মানলেও তারা প্রতিবাদ করতে পারেন না।

৪) যখন-তখন কাজ থেকে ছাঁটাই আজ কোন চুক্তি-ভিত্তিক শ্রমিকের কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই। মালিক যে কোন কারণে, যে কোন অজুহাতে তাদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিতে পারে। মোদী সরকারের তথাকথিত মেক ইন ইন্ডিয়া প্রজেক্ট বাস্তবে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা অনুযায়ী সস্তা শ্রমের যোগান দেওয়া। যখন-যখন বাজারে মন্দা আসছে, শ্রমিকদের নির্বিচারে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। পি ইউ ডি আর-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে একদিন কাজে না আসার জন্য ভিভো এবং হাইপ্যাড কয়েকশো শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেয়। ওম্যাক্স একই কারণে ৭০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করে। ঠিকা শ্রমিকদের জন্য ই এস আই ও পি এফের সুবিধা দাবি করায় প্রেমচাঁদ জুট মিলের ম্যানেজমেন্ট ১২ জন ঠিকা শ্রমিক, যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাদের ছাঁটাই করে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের খরচ নিজেরা যোগাড় করো বলার পর আইসার কলকাতা ও মোহালিতে চুক্তিভিত্তিক

শ্রমিকদের সঙ্কোচন করার চেষ্টা হয়।

৫) কর্মস্থলে নিরাপত্তার অভাব শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার অবহেলার কারণে আজ সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে দূর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, শ্রমিকদের মৃত্যু ও জখম হওয়ার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। বাজি কারখানা, রঙ কারখানা, প্ল্যাস্টিক কারখানা, জামা কাপড়ের গুদাম, ইলেকট্রনিক জিনিসের ওয়ারহাউজ প্রভৃতিতে আগুন লেগে প্রতি বছর শতাধিক শ্রমিক মারা যাচ্ছেন। দুর্ঘটনা ঘটার পর কয়েকদিন মিডিয়ায় লেখালেখি হয়, মালিক বা কর্তাব্যক্তিদের পুলিশ গ্রেফতার করে, তারপর তারা কয়েকদিনের মধ্যেই জামিন পেয়ে যায়। সরকার কিছু ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে, কিন্তু সেই টাকা আদৌ মৃত শ্রমিকদের পরিবারে পৌঁছায় কিনা সন্দেহ! জুট মিলগুলোতেও পরপর অগ্নিকাণ্ড ঘটছে, দুর্ঘটনাতে শ্রমিকরা মারাও যাচ্ছে। ঠিকা শ্রমিক হলে ইউনিয়নের সহযোগিতায় পরিবারের হাতে অল্প কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে মালিক দায় সেরে দেয়।

৬) ইউনিয়ন গড়ে তোলার পথে বাঁধা শাসকশ্রেণীর দলগুলোর ইউনিয়নগুলি সব জায়গাতেই মালিকের হয়ে কাজ করে। যেখানে-যেখানে শ্রমিকরা এই ইউনিয়নগুলোর বাইরে এসে নিজেরা সংগঠিত হতে চেষ্টা করছেন বা কোন সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন এর সাথে যুক্ত হতে চাইছেন, সেখানে তারা প্রচন্ড বাধার মুখে পড়ছেন। আমাদের রাজ্যে সরকার তো ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এর প্রক্রিয়াকেই এত জটিল করে দিয়েছে যে শাসক দল, বা নিদেনপক্ষে বিরোধী সংসদীয় দলের পতাকাতলে না আসলে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন কার্যত অসম্ভব। অফিস ঠিকানার শংসাপত্রে কাউন্সিলর, বিধায়ক বা এম পি র সাক্ষর থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও ইন্সপেকশন এবং শুনানির সময় নানা ভাবে হয়রান করা ও ঘোরানো হয়। আইসার কলকাতার ঠিকা কর্মচারীরা ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এর জন্য দু বছরের বেশি সময় ধরে ঘোরার পর রেজিস্ট্রেশন করতে সক্ষম হন।

৭) শ্রম দফতরের ভূমিকা যাদের দায়িত্ব ছিল শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থকে রক্ষা করার, তারাই হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিকদের অধিকার অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বেশ কিছু ঘটনায় দেখা যাচ্ছে শ্রম দফতর বা তার অফিসাররা সরাসরি মালিকের পক্ষে কাজ করতে নেমে পড়েছে। পি ইউ ডি আর-এর রিপোর্ট বলছে, দিল্লিতে এল জি ইলেকট্রনিক্স-এর শ্রমিকরা দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাদের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করতে সক্ষম হয়। ম্যানেজমেন্ট এর বিরুদ্ধে শ্রম দফতরে আপিল করলে তারা সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন ক্যানসেল করে দেয়। প্রেমচাঁদ জুট মিলে ১২ জন ঠিকা শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়ার পর যখন শ্রমিকরা উলুবেড়িয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার এর দ্বারস্থ হয়, তিনি ১ বছর সময় নিয়ে তিনটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেও সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। মালিকপক্ষ একবারও বৈঠকে আসল না। তারপর ফেলিওর রিপোর্ট দিতে লেবার কমিশনার আরও প্রায় ১ বছর সময় লাগিয়ে দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের পক্ষে ২ বছর পেটে গামছা বেঁধে লড়াই চালানো সম্ভব নয়, তারা অন্য জায়গায় আবার ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজে যুক্ত হয়ে গেলেন।

৮) পুলিশের ভূমিকাঃ শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকা সবসময়ই পক্ষপাত দুষ্ট। অর্থাৎ মালিকের পক্ষে। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নামে শ্রমিকদের অবস্থান, বিক্ষোভ, ঘেরাও ভাঙা, লাঠি চার্জ করা, গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া, শ্রমিক নেতাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, জামিন অযোগ্য ধারা দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষী হাজির করে সাজা করানো ইত্যাদি কাজগুলো ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বিগত ৭৫ বছর ধরে নিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতার সাথে করে আসছে। উপরের বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী মানুষরা কী পরিমাণ চাপের মধ্যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে দুর্বিসহ জীবন অতিবাহিত করছে। ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির মুখে যৎসামান্য মজুরি দিয়ে জীবিকা নির্বাহ না-করতে পারার যন্ত্রণার মধ্যে বর্তমানে বেঁচে আছেন।

লেবার কোড ২০১৯-২০

ক) মজুরি সংক্রান্ত কোড ২০১৯

শ্রমিকদের মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হবে সেই বিষয়ে একটা ধোঁয়াশাপূর্ণ সূত্র এই কোড এনেছে। ১৯৯২ সালে রেপ্টাকোস ব্রেট কোম্পানির সাথে শ্রমিকদের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত ৬ টি বিষয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এর মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেছিল—

১) পরিবার পিছু তিন ইউনিট সদস্য (পুরুষ শ্রমিক ১ ইউনিট, তার স্ত্রী ০.৮ ইউনিট, দুই সন্তান ০.৬ ইউনিট করে)

২) প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দৈনিক ২৭০০ ক্যালোরি খাদ্যের প্রয়োজন।

৩) প্রত্যেক পরিবারের বছরে ৭২ গজ বস্ত্রের প্রয়োজন।

৪) সরকারী হাউজিং স্কীমের অন্তর্ভুক্ত ন্যূনতম বাসস্থানের এরিয়া হিসেবে বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ।

৫) জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ন্যূনতম মজুরি র ২০ শতাংশ অর্থ ধার্য করতে হবে।

৬) সন্তানের খরচ, শিক্ষা, চিকিৎসা, ন্যূনতম বিনোদন, উৎসব, বিয়ে, বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয় প্রভৃতির জন্য ন্যূনতম মজুরি র ২৫ শতাংশ ধার্য হবে।

মজুরি সংক্রান্ত কোডে এইসব বাতিল করে বলা হয়েছে যে, ন্যূনতম মজুরি কাজের সময় অনুযায়ী অথবা উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে নির্ধারিত হবে। মজুরির সময়কাল ঘন্টা ভিত্তিতে, দৈনিক ভিত্তিতে বা মাসিক ভিত্তিতে হতে পারে। এই কোডে বলা হয়েছে যে যদি কোন শ্রমিকের কাজে মালিক সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে লস রিকভার করার জন্য তার মজুরি থেকে টাকা কেটে নিতে পারে। এই কোডে জাতীয় ফ্লোর লেভেল মিনিমাম ওয়েজ বলে একটা বিষয় আনা হয়েছে। ২০১৯ সালের জন্য জাতীয় ফ্লোর লেভেল মিনিমাম ওয়েজ প্রস্তাব করা হয়েছে দৈনিক ১৭৮ টাকা অর্থাৎ ২৬ দিনে মাস ধরলে ৪৬২৮ টাকা মাসিক। অথচ শ্রম ও কর্ম নিযুক্তি মন্ত্রক দ্বারা গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ছিল এটা দৈনিক ৩৭৫ টাকা করা। এই কোড অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলো সেই রাজ্যের ন্যূনতম মজুরি স্থির করবে। কিন্তু তা কোনও ভাবেই জাতীয় ফ্লোর লেভেল মিনিমাম ওয়েজ-এর কম হবে না। আর একটা বিষয় হল, শ্রমিকদের দক্ষ, অর্ধ দক্ষ, অদক্ষ- এই বিভাজন কোডে বিলোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সবার জন্যই একই মজুরি হবে। এর ফলে এই রকম সম্ভাবনা থাকছে যে, যে-সমস্ত সেক্টরে সবচেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়, সেগুলোকে ভিত্তি ধরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ। ফলে, যে সমস্ত সেক্টরে বর্তমানে মজুরির হার তুলনামূলকভাবে বেশি, সেখানে মজুরি কমার সম্ভাবনা থাকছে। এই কোডে ওভারটাইমের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। নতুন কারখানাগুলোকে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

খ) শিল্প সম্পর্ক কোড ২০২০

এই কোড অনুযায়ী শিক্ষানবিশদের শ্রমিকদের পর্যায়ভুক্ত করা হয় নি। এছাড়াও যারা সুপারভাইজার ক্যাটাগরিতে চাকরি করেন এবং মাসিক ১৮০০০ টাকার বেশি বেতন পান তারাও আর শ্রমিকের আওতাভুক্ত হবেন না। ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট নামে এক নতুন ধরনের ঠিকা কাজের ধারণা এই কোডে দেওয়া হয়েছে। এতে ঠিকা শ্রমিকেরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজে নিযুক্ত হবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হবেন এবং সেই সময় শেষ হবার পর ম্যানেজমেন্ট চাইলে চুক্তি রিনিউ করতে পারে এবং না চাইলে ঠিকা শ্রমিকটিকে অন্য কাজ খুঁজে নিতে হবে। এবং এটাকে ছাঁটাই বলে গণ্য করা হবে না। শিল্প সম্পর্ক কোডে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, তার রেজিস্ট্রেশন ও স্বীকৃতির বিষয়টিকে যথেষ্ট জটিল ও কঠিন করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ম্যানেজমেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনিয়নের সাথে দরকষাকষির আলোচনা করে, অন্য রেজিস্টার্ড ইউনিয়নগুলোকেও সেই বৈঠকে ডেকে নেয়।

বর্তমানে যে কোন ইউনিয়ন, যে এক বছর ধরে কাজ করছে এবং কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের ১৫ শতাংশ শ্রমিক যার সদস্য, মালিকপক্ষের সাথে দর কষা-কষির জন্য বৈঠক করার স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। নতুন কোডে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এর জন্য ১০০ জন শ্রমিক অথবা মোট শ্রমিকের ১০ শতাংশ এর সমর্থন, দুটোর মধ্যে যেটা কম লাগবে সেটি প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে যদি একাধিক ইউনিয়ন থাকে, তাহলে যার ৫১ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন আছে, সেই ইউনিয়ন একমাত্র দরকষাকষির জন্য স্বীকৃতি পাবে। যে সমস্ত সেক্টরে অনেক গুলো ইউনিয়ন আছে, সেখানে কারওই ৫১ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন নেই এবং যদি দেখা যায়, ছোট ছোট অনেকগুলো ইউনিয়ন আছে, তাহলে একটা নেগোশিয়েটিং কাউন্সিল গঠন হবে, যেখানে মালিকদের প্রতিনিধি থাকবে। আর যে সমস্ত ইউনিয়নের অন্ততপক্ষে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন আছে, তারা থাকবে।

ধর্মঘট করতে গেলে শ্রমিকদের ১৪ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। সেই নোটিশ ৬০ দিন অবধি বৈধ থাকবে। ধর্মঘটে যাবার দু দিন আগে বিষয়টি মীমাংসাকারী অফিসারকে জানাতে হবে। যতক্ষণ না মীমাংসার প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে পারবেন না। মীমাংসা প্রক্রিয়া ৬০ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলতে পারে, ততদিনে নোটিশের বৈধতা শেষ হয়ে যাবে। ফলে আবার নতুন করে নোটিশ দিয়ে একই মীমাংসার প্রক্রিয়া চালাতে হবে। এইভাবেই অনন্ত কাল কেটে যাবে। যদি উপরিউল্লিখিত নিয়ম ঠিক মতো পালন না করে ধর্মঘটে যাওয়া হয়, তাহলে সেই ধর্মঘটকে অবৈধ ও বেআইনি বলা হবে এবং ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শ্রমিকের বিরুদ্ধে জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই

কোড ক্যাজুয়াল লিভকে ধর্মঘটের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। যদি ৫০ শতাংশ বা তার বেশি শ্রমিকরা একসাথে গণ ক্যাজুয়াল লিভ নেন, সেটাকে ধর্মঘট বলে বিবেচনা করা হবে। ম্যানেজমেন্ট যদি ৩০০ জন বা তার অধিক শ্রমিককে ছাঁটাই করে তবেই একমাত্র সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। যদি ছাঁটাই, লে অফ, ফ্যাক্টরি বন্ধের জন্য আবেদন করার ৬০ দিনের মধ্যে সরকার কোন উত্তর না দেয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে সরকার অনুমতি দিচ্ছে। এইভাবে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয়তা দিয়ে সরকার শ্রমিকদের মালিকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। বর্তমান আইন অনুসারে ছাঁটাই হওয়া বা বসিয়ে দেওয়া শ্রমিকরা নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান। এই নতুন কোডে সেই অগ্রাধিকারের মেয়াদ থাকবে ছাঁটাই হবার দিন থেকে ১ বছর পর্যন্ত। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ৩০০ বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করেন, সেখানেই এই নতুন শ্রম কোডগুলো লাগু হবে। বাকি জায়গায় কোন শ্রম আইন বলবৎ থাকছে না।

গ) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোড ২০২০

নামে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হলেও বাস্তবে এতে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিই রাখা হয় নি। এই কোডের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রতি নিয়োগকর্তার অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব কমানো হয়েছে। এখন ১২ শতাংশ এর পরিবর্তে নিয়োগকর্তাকে শ্রমিকের মজুরির ১০ শতাংশ পি এফ ফান্ডে জমা করতে হবে। ই এস আই স্কীমেও মালিকদের জমা করা অর্থের পরিমাণ শ্রমিকের মজুরির ৪.২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩.২৫ শতাংশ করা হয়েছে, একই ভাবে শ্রমিকের যোগদানের পরিমাণও ১.৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৭৫ শতাংশ করা হয়েছে। এই সমস্ত স্কীমে অংশগ্রহণ করতে গেলে শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক-ভাবে আধার নম্বর লিঙ্ক করাতে হবে।

ঘ) পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত কোড ২০২০

একমাত্র যে সমস্ত কারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার হয়, সেখানে ২০ জন শ্রমিক কাজ করলে এবং যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার হয় না, সেখানে ৪০ জন শ্রমিক কাজ করলে এই কোড প্রযুক্ত হবে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর ৮০ শতাংশ ছোট ছোট অর্থনৈতিক ইউনিটে কাজ করে, ফলে তারা এই কোড এর বাইরে চলে যাবে এবং তাদের কাজের জায়গার নিরাপত্তা নিয়ে এই কোড মাথা ঘামাবে না। যে সমস্ত কারখানায় ৫০০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করেন, সেখানে এই কোড অনুযায়ী একটা সেফটি কমিটি বানানোর কথা বলা হয়েছে। সেফটি কমিটিতে মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকবে, দুপক্ষের প্রতিনিধি সংখ্যা সমান সমান হতে পারে। এই কোড অনুযায়ী দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘন্টা নির্দিষ্ট করা হলেও সরকারকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী একে পরিবর্তন করার। মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বর্তমান আইন অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭ টার পরে এবং ভোর ৬ টার আগে কোন কারখানায় কাজে নিয়োগ করা যাবে না বলে নিয়ম ছিল। এই কোডে মহিলা শ্রমিকদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সমস্ত ধরনের কাজে দিনের যে কোন সময় তাদের সম্মতি নিয়ে নিয়োগ করা যাবে। এখানে সম্মতি বিষয়টা গোলমেলে। কারণ কাজ হারানোর ভয়ে সর্বদা তটস্থ শ্রমিকদের পক্ষে এই সম্মতি অনেকটাই বাধ্যতামূলক সম্মতি। এই কোডে মালিকের দায়ে বা অবহেলায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু হলে ক্ষতি পূরণের সর্বোচ্চ সীমা ২.৫ লক্ষ টাকায় বেঁধে দিয়েছে। একই সাথে এই কোডে শিল্প দুর্ঘটনার জন্য মালিকের সাথে সাথে শ্রমিককেও দায়ী করার বিধান রেখেছে। যদি দেখা যায় যে, কোন শ্রমিক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তাহলে তাকে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে এবং তাকে জেলেও দেওয়া যেতে পারে।

ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

শাসক শ্রেণীর কোন রাজনৈতিক দল কোনও দিনই প্রকৃত অর্থে শ্রমিক স্বার্থের পাশে দাঁড়ায় নি। আজও দাঁড়াবে না। সেই দলগুলোর ছত্রছায়ায় থাকা ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর ভূমিকাও একই। বাকি থাকে ছোট ছোট অসংখ্য সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন, অধিকার সংগঠন ও প্রগতিশীল গণ সংগঠন। তারা তাদের সাধ্যমত প্রতিবাদ, লড়াই করলেও সেই লড়াই পূর্ণতা পাবে না; যদি না আমাদের দেশের শ্রমিকদের ও শ্রমজীবী জনগণ নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন এবং লড়াইয়ের ময়দানে নামেন। মালিকের পক্ষে কাজ করা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দ্বারা বার্ষিক ধর্মঘট নয়, বরং যদি সত্যিকারের শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে সেই আন্দোলন যে সবসময় শাসকের বেঁধে দেওয়া সাংবিধানিক ও আইনি দায়রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। একমাত্র শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই-ই পারে এইসব লেবার কোড সহ সমস্ত শ্রমিক বিরোধী আইন কানুনকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে।

আর কতটা মরলে পরে জাগবে তুমি বলো!

মৌতুলি নাগ সরকার

খবরে এলো, ১৯-০৪-২০২৩-এর 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র দৈনিকে; চারজন অভিবাসী শ্রমিক মৃত্যুর কথা। বিহারের সমস্তিপুরের চারজন শ্রমিক যারা হরিয়ানার শিব শক্তি রাইস মিলে কাজ করতে গিয়েছিলেন। থাকার জায়গা বলতে যাদের জুটেছিল তিনতলা রাইস মিলের নিচে কয়েকটা গর্ত-বিশেষ আস্তানা। ভগ্ন প্রায় রাইস মিল যে-কোনও দিন ভেঙে পড়তে পারে, সেকথা জানতেন মিল মালিক। তবু ও খরচ বাঁচাতে ১৫০ জন শ্রমিকের এই তিনতলার ভগ্নাবশেষে জমা হওয়া তাঁর কাছে মনে হয়েছিল এক চলে আসা নৈমিত্তিক সাধারণ বিষয়। তাই, মেরামত হয়নি ঐ রাইসমিল।

ঠিক যেমনটা মনে করেন ইট ভাঁটা থেকে শুরু করে চটকল মালিকরা। আর এই মনে করা, আর মুনাফার স্বার্থে মৃত্যু নেমে আসে অওদেশ, পঙ্কজ, চন্দন ও সঞ্জয় দের ওপর। যারা সবাই অভিবাসী শ্রমিক। যারা জীবিকার খোঁজে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিলেও তাদের জন্য সুরক্ষিত হয়-না মানবাধিকার। জীবন বা সামাজিক সুরক্ষার কোনো নিয়মই এই শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হয় না। হরিয়ানার রাইসমিলের মালিক না-কী আট লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে! আজকের ভারতবর্ষে এটা-ই সবচাইতে বড় প্রহসন। জীবনের সুরক্ষা দিতে পারেন বা না-পারেন খুব সহজেই মালিক বা কর্তৃপক্ষরা মৃত্যুর সওদা করে ফেলেন। কাগুজে অঙ্কে ঢেকে রাখে ওরা শবদেহগুলো। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘোষিত ক্ষতিপূরণ মৃত শ্রমিকের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছয় না। কারণ, শ্রমিকরা যে লেবার-সর্দার বা ঠিকাদারের হাত ধরে 'দেশে'র বা তার চির চেনা গ্রাম-শহরের সীমানা পেরোন তিনি রাতারাতি গা' ঢাকা দেন। শ্রমিক পরিবার জানেনই না যে, পরিবারের রোজগেরে সদস্যটি কোন শহরে, কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে গেছেন বা কোন অবস্থায় কাজ করছেন! তাই ক্ষতিপূরণ দাবি পর্যন্ত করতে পারেন না বা কোথায় কী-ভাবে করবেন তারও হদিশ পান না। শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে মালিক তার পিঠ বাঁচিয়ে নিতে পারেন। দাবিদার দূর্বল হলে তা' দেওয়ার দায় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নে'ন। মুনাফা বা উৎপাদনে টান পরে না। মৃত্যুগুলোও একটা সময় অস্বাভাবিক থাকেনা আর।

দুই বছর আগে এরকম চারজন শ্রমিক, লিয়াকত, সাবির আলি, মহম্মদ আলমগীর, জাহাঙ্গীর আলম মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় ম্যানহোল-শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে কোনো রকম সুরক্ষা কবচ না-থাকায় তলিয়ে যায় মহানগরের বিষ্ঠা বলয়ে। খিদের সুরক্ষার কাছে আসলে জীবন আর সামাজিক সুরক্ষা এক বিলাসিতা, এই আয়ের প্রান্ত সীমায় থাকা শ্রমিকদের কাছে। পরিসংখ্যান বলছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গত আঠারো মাসে প্রায় ছাপান্নটি অভিবাসী শ্রমিকমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আঠারো জন অভিবাসী শ্রমিক মারা গেছেন এই আঠারো মাসে। অর্থাৎ প্রতি পাঁচদিনে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিজের জেলা বা রাজ্যে কাজের সংকট, কল কারখানা বন্ধ, কৃষক, তাঁতী বা মৎসজীবীদের এক বৃহৎ অংশ বিশেষতঃ পরবর্তী প্রজন্ম আজ পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে বা গ্রাম থেকে শহরে। এই বছরের বাজেটে MGNREGA প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে আনা রাজ্য সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যের শ্রমিকদের কাজের খোঁজে অভিবাসনকেই অনিবার্য্য করে তুলেছে। ২০১১ আদমসুমারি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় ৫.৮ লক্ষ অভিবাসী শ্রমিক (গ্রাম ও শহর থেকে) দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের খোঁজে গেছেন। কিন্তু নিজের রাজ্য হোক বা যে রাজ্যে তারা কাজ করতে যাচ্ছেন, অভিবাসী শ্রমিকদের দায় নেয় না দুই রাজ্যের কোনও সরকার-ই। ফলতঃ মালিক বা কর্তৃপক্ষের মর্জির ওপর-ই নির্ভর করে তাদের জীবন ও মৃত্যু। অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা মৌলিক অধিকারের সমস্ত দিক তাই লুঠ হয়ে যায় দিনের আলোয়।

আই এল ও রজারস রিপোর্ট ২০০১ অনুযায়ী, মাত্র ১০ু অভিবাসী শ্রমিক পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা পা'ন, বাকি'রা শিকার হন শোষণের। সিং রিপোর্ট ১৯৯৭, বলছে; বিশ্বের কোনও উন্নয়নশীল দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নেই। এমন কী নেই জাতীয় আইনও। ভারতে Inter State Migrant Workers (Regulations of Employment and Conditions of Service), Act ১৯৯৭ থাকলে ও শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষার প্রশ্নে কার্যকরী হয়নি আইনটির নূন্যতম কোনও নির্দেশ। শ্রম আইনের আওতায় না-থাকা এই অভিবাসী শ্রমিকরা আজ তাই সামাজিকভাবে অদৃশ্য হয়ে আছেন। সংশয় দেখা দেয় শ্রমিকদের আত্মপরিচয় নিয়ে। নিজের রাজ্যে পরিযায়ী বা অভিবাসী শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে হয়ে যান 'বহিরাগত'। এমন-কী এইসব অভিবাসী বা বহিরাগত শ্রমিকরা অন্য রাজ্যের স্থানীয় শ্রমিকদের হুমকির মুখেও পড়েন। মজুরি বৈষম্য এই হুমকির এক অন্যতম কারণ। জন সাহসের একটি রিপোর্ট দেখাচ্ছে, ভারতের অভিবাসী শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি দিন প্রতি ২০০ থেকে ৪০০ টাকা। যেখানে নূন্যতম সরকারি মজুরি দিন প্রতি ৬৯২/ (দক্ষ),

৬২৯/(অর্দ্ধ দক্ষ) ও ৫৭১/ (অদক্ষ) ! এখন, মনে করার কোনও কারণ নেই যে, এই ২০০-৪০০ টাকা একজন শ্রমিক পান। কারণ, এই মজুরির ওপর ভাগ বসে ঠিকাদারের ,যার হাত ধরে তারা কাজ পেয়েছেন। অতএব, পরিবার ও নিজের চাহিদা মেটাতে ওভারটাইম কাজ করতে হয়। অর্থাৎ একজন শ্রমিক দিনে প্রায় আঠেরো ঘন্টা কাজ করেন। বাধ্য হয়ে। কমে শ্রমিকের জীবনী-শক্তি ও কার্য ক্ষমতা, প্রতিদিন একটু-একটু করে। কোনও শ্রম আইন বা অভিবাসী শ্রমিক আইন পারে না এই বঞ্চনা ঘোচাতে। এখন মালিক বা কর্তৃপক্ষ তার উৎপাদন ও মুনাফার স্বার্থে চায় একটা শ্রমশক্তি। তাদের এই চাহিদার খিদে এতই তীব্র যে তারা ভুলে যায় এই শ্রমশক্তি আছে শ্রমিকের দুই হাতে, যারা পূর্ণাঙ্গ মানুষ। যাদের এই সমাজে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে বাঁচবার অধিকার আছে। কিন্তু মালিকের তো মুনাফা অর্জন-ই লক্ষ্য, তাই আইন ভাঙতে তিনি শাসকদল ও প্রশাসনের সংগে সমঝোতা করে চলেন। 'সমঝোতা' আমাদের দেশের এক ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। ফলতঃ জীবন থেকে জীবিকা, সমাজ থেকে অর্থনীতি সুরক্ষার প্রশ্নটি পেন্ডুলামের মতো ঘুরতে থাকে, এই শোষণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কেন্দ্রে।

মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে অভিবাসী শ্রমিকের দিনলিপি লেখা থাকে মিলের গর্তের অন্ধকারে। রাষ্ট্র সে লেখার অক্ষর চেনেনি কখনও, মালিকেরা সে ভাষা পড়ে দেখেনি কখনও। একজন শ্রমিকের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণও ঘোষিত হয় না। বঞ্চনা আর শোষণ যদিও এখানে-ই থেমে থাকে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ বিশেষে বঞ্চনার ও রকমফের থাকে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুলত ভিন রাজ্যে কাজে যান মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে। যার মধ্যে গত বছর শুধু মুর্শিদাবাদেরই ছাব্বিশ জন অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই জেলাগুলি থেকে মুলত মুসলিম, আদিবাসী শ্রমিকরা-ই যান। যাদের ভাষাগত পরিচিতির কারণে যখন-তখন তাদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। লক-ডাউন চলাকালীন খোদ ব্যাঙ্গালোর শহরে এই ঘটনা ঘটে ২০২০-তে। পরিচয় পত্র-জনিত সমস্যা না-থাকলেও আজকের ভারতবর্ষে তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নিয়োগকর্তা সে সুযোগ হাতছাড়া করেন না। আত্মপরিচয়ের সংকটকে উস্কে দিয়ে বরং তিনিই সুবিধাজনক অবস্থায় থাকেন। কাজ হারানোর জুজু দেখিয়ে ঐ শ্রমিককে দিয়ে তখন বেগার খাটিয়ে নেওয়া যায়, মানতে বাধ্য করানো যায় মালিকের অন্যায় আবদারও। মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা, পুরুষ শ্রমিকের চাইতে কম মজুরি, অসুস্থতা বা মাতৃত্ব কালীন ছুটি না-দেওয়ার মতো ব্যবস্থা চালু রেখেছেন নিয়োগ কর্তারা। আর তাকে সমর্থন জুগিয়েছে এই রাষ্ট্র।

অভিবাসনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই শোষণ আর বঞ্চনার জন্য দায়ী রাজ্য সরকারগুলি। আমাদের রাজ্যে কৃষি, তাঁত মৎসশিল্পের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষেত্রগুলি আজ মুখ থুবড়ে পরেছে রাজ্য সরকারের মদতেই। কৃষিক্ষেত্রে সার, ডিজেলের দাম বৃদ্ধি, মান্ডিতে ফসল বিক্রি না-করে দালালদের হাতে কৃষিবাজারকে ছেড়ে দেওয়া, গাছ কেটে পরিবেশে স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করা (বৃষ্টি না হওয়া বা বন্যা) সব-ই হয়েছে সরকারের হাত ধরে। হস্তচালিত তাঁতের পরিবর্তে যন্ত্রচালিত তাঁত কাজ কেড়েছে অধিকাংশ তাঁত শ্রমিকের, মালিক বা মহাজনের যদিও তা'তে লাভ-ই হয়েছে। উৎপাদন বেড়েছে, বেড়েছে মুনাফাও। শ্রমিক হারিয়েছে কাজ; যে কাজ সে বাপ-ঠাকুরদা'র কাছ থেকে শিখেছিল। তাঁত বুনতে ক্লান্ত হয়ে গেলে যার বৌ হাত লাগাত অথবা ধরিয়ে দিত এক গ্লাস জল। দেশের গন্ডী পেরিয়ে অভিবাসনে যাওয়া শ্রমিকের এইসব স্মৃতির মাধুর্য্য কোথায় লুকানো থাকে কে-জানে! মৎসশিল্পের ক্ষেত্রেও আছে প্রান্তিক মৎসজীবীদের দাবিয়ে রাখতে শাসকদলের দখলদারি। এই দখলদারি, ক্ষমতার, অর্থের ও সামাজিক প্রতিপত্তির। সংস্কারহীন নদী বন্ধ্যা হয়ে তার চলনশক্তি হারিয়েছে। কমেছে মাছের জোগান ।আর যেটুকুও-বা মাছ মেলে, তার ওপর দখল বসায় 'বাঁধাল' দিয়ে। কারা দেয় 'বাঁধাল'? ক্ষমতার কাছাকাছি থাকে সে সমস্ত মৎসজীবীরা তারা। সমর্থন থাকে স্থানীয় নেতা থেকে প্রশাসনের। থাকে, প্রান্তিক মৎসজীবীদের প্রাণের ভয়। দৈনিক আয় তিন'শো টাকা থেকে কমে দাঁড়ায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশে। অগত্যা ভিন রাজ্যে ভিন্নরকম শোষণের শিকার হন তারা।

নদিয়ার সোনডাঙার পঞ্চাশোর্ধ অভিবাসী শ্রমিক, আতিয়ুর মন্ডল। এক দুপুর বেলা চোয়ালে রাখা পান চিবোতে-চিবোতে জানান, আর ফিরব-না ঐ বোম্বে। আট কাঠা জমি খুঁটে যা পাবো, তাই খাবো। কিন্তু কেন? সহজ উত্তর মেলে, আমাদের এই সমাজ ঠকিয়েছে, আর ঠকিয়েছে কোম্পানী। এই বয়সে এসে আর ঠকবো না-গো! হরিয়ানার রাইসমিলের চারজন শ্রমিক মৃত্যুর পেছনে আসলে এই ঠগবাজ ব্যবস্থা-ই দায়ী। দায়ী তো আমরাও, যারা খবর না হলে লিখতে বসি না। যে সমাজ আতিয়ুর ভাইকে ঠকিয়েছে; আমরাও যে সেই সমাজের অংশ। তাই সরকার বা রাষ্ট্র দায় ঝেড়ে ফেললে আমাদের দায় থাকে না-কি প্রতিটি মৃত্যুর হিসেব চাইবার?

শ্রমজীবী মেয়েদের কথা

নিশা বিশ্বাস

জানার কোনো শেষ নেই, মার খাওয়ারও কোনো বয়স নেই— বললো রেখা। কথা হচ্ছিল ইলেক্ট্রিক বিল অন-লাইন পেমেন্ট নিয়ে। ও বললো পাড়ার দোকানে দশ টাকা দিয়ে ইলেক্ট্রিক বিল জমা দেয়। কাকু বলেছিলো 'কেন দশ টাকা বেশি দাও? তোমার মোবাইলে তো জী-পে আছে। শিখে নাও। নিজেই পারবে'। সেই প্রসঙ্গে রেখার এই উক্তি। সে অনায়াসে ঝাড়ু মারতে মারতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বছর তিরিশের রেখা দেশের ৫কোটি মহিলা গৃহশ্রমিকের একজন। ক্লাস টু পাস, দুই বাচ্চার মা। রেখা কাজে ঢুকেছিল ১০ বছর বয়সে। আর থামেনি। এখন সে পাঁচবাড়ি কাজ করে মাস গেলে ১২ হজার টাকা পায়। তবে কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আজ আছে কাল নেই। কোভিডকালে সম্পূর্ণ বাড়ি বসা। কাজে বেরোতে পারছে না, তাই গৃহকর্তা/ কর্ত্রী মাইনেও দিচ্ছে না। আর বেরোলেও কি কেউ তাকে কাজে নেবে? কারণ তারা নাকি 'ভাইরাস ক্যারিয়ার'। লক-ডাউন খুলে গেলেও অনেকে কাজে নেয় নি। তাই আবার খোঁজো কাজ, যেমন তার সাথে হয়েছিল বাচ্চা জন্মানোর পর। তবে এই বার গল্প কিছু আলাদা। কাজ কম, লোক বেশী। দু দিনেই বুঝে গেল যে আগের মাইনে পাওয়া কঠিন। তাই যা পাওয়া যায় আর কি! উপায় কি! ধারদেনা বেড়ে গেছে কতগুণ। পুরোনো ক'জনকে তো দেখতেই পাচ্ছে না। পাচার হয়ে গেল না তো? কেই বা হিসাব রাখে!

মেয়েদের কাজের পরিসর সঙ্কুচিত। তারা প্রধানত সবচেয়ে কঠিন, অনিয়মিত, একঘেঁয়ে এবং কম মূল্যের কাজ করে। কৃষি ও নির্মাণ কাজে যুক্ত রয়েছে মোট নারী শ্রমিকের ৭৫ শতাংশ এরও বেশী। সমাজ ধরেই নিয়েছে যে, তএকটি মেয়ে পুরুষের মত কাজ করতে পারে নাদ। বুদ্ধি ও দক্ষতা কি আছে তাদের? বেশীর ভাগই রয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। রাহিমা অর্থাৎ রেণু করতো রাস্তার কাজ। কাজটা অস্থায়ী, তাই ঠিকাদারকে বেশ তোয়াজ করে চলতে হত। রাহিমা, রেণু নাম নেয় গৃহস্থালী কাজ করার সময়। রেণু নামের রাহিমা কাজ পেলো সহজেই। হয়তো রেণু ওরফে রাহিমা গৃহস্থালী কাজ থেকে বেশী রোজগার করতে পারতো রাস্তার কাজ করে। কিন্তু সে কষ্ট পেতো যখন সমান দক্ষতার সাথে একই কাজ করলে পুরুষরা তার থেকে বেশ বেশী, কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিগুণও পারিশ্রমিক পেতো। তার সাথে ছিল মেয়েদের ইঙ্গিত করে যৌন হাস পরিহাস, যা তাকে বীভৎস অস্বস্তিতে ফেলতো। সুযোগ পেলেই তারা গায়ে হাত যে দেয়নি তাও নয়।

নতুন প্রযুক্তি আসার আগে কারখানাগুলিতে নিম্ন মানের, একঘেঁয়ে কাজগুলি করতো মেয়েরা। যান্ত্রীকরণের ফলে তাদের কাজ যায়, ট্রেনিংএর সুযোগও তারা পায়নি। আধুনিকীকরণ তাদের কাজের একঘেঁয়েমি কাটাতে পারেনি, কাজের কোনো বৈচিত্র্য আসেনি বরঞ্চ কাজটাই কমে গেছে। কৃষি আধুনিকিকরণ হওয়ায় তারা হলো ক্ষেত মজুর। নির্মাণ কাজে তারা ইট, বালি-সিমেন্ট মিশ্রণ বয়ে আনার মজুর। মজুরী কম আর খাটুনি হাড়ভাঙ্গা। কাপড় বোনার আনুষাঙ্গিক সমস্ত কাজ তারা করবে, কিন্তু কাপড় বুনতে পারবেনা। যেমন কৃষির সমস্ত কাজ তারা করবে কিন্তু বীজ বোনা ও ফসল তারা কাটতে পারবে না। এ যেমন একটি মজুত শ্রমবাহিনী। যখন যাদের কাজে লাগবে, তারা যৎসামান্য মজুরি দিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে। আর গৃহকর্ম তো কাজই নয়, তাই শ্রম নিয়ে প্রশ্ন করা চলবে না।

অনেক সময় মেয়েদের রোজগার অর্থনীতির হিসাবেও ধরা হয় না। স্টেট ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী মেয়েদের অবৈতনিক গৃহকাজেকে প্রথাগত অর্থনীতীর হিসাবের বাইরে রাখার কারণে জিডিপিতে তাদের ৭.৫ শতাংশ অবদান অবহেলিত থেকে গেছে। এ কেমন দেশের অর্ধেক জনতার অদৃশ্যকরণ?

অন্যদিকে মেয়েরা কত রকমের কাজ করে যে সংসার বাঁচিয়ে রাখে তার হিসাব কি কোনোদিনও হবে? কত ছোটো ছোটো কাজ ফুরনে, সামান্য মজুরির বিনিময়ে ছোটোবড় কারখানার মালিকরা অথবা তাদের দালালরা মেয়েদের দিয়ে করায়, তাদের শোষণের কথা সবাই জানি কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে? তাদের বিশ্রাম অথবা বিনোদনের সময় কোথায়? এই সময়ের 'সদ্ব্যবহার' করে তারা সামান্য মজুরির বিনিময়ে বোতাম-হুক লাগিয়ে, জরীর কাজ ইত্যাদি ধরণের সুচিকর্ম করে। কোনো শীতের দুপুরে মেটিয়াব্রুজের বস্তিতে গেলেই দেখতে পাবেন বাড়ির বাহিরে সারি সারি নত মাথা সুচিকর্মব্যস্ত মেয়েদের। এই সব কাজে বয়সের কোনো সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ সীমা নেই।

বিড়ি বেঁধে, দিনে মাত্র ৪ ঘন্টা ঘুমিয়ে কোমর পিঠের ব্যথায় জর্জরিত নারী বিড়ি-শ্রমিক। দেশে ৭০ শতাংশ বিড়ি শ্রমিক হচ্ছে মেয়েরা। তাদেরও বয়সের কোনো সর্বনিম্ন কিংবা সর্বোচ্চ সীমা নেই। তাই যত দিন পারা যায় এই কাজ করা। এই মেয়েরা রক্তাল্পতা, ক্লান্তি সম্পর্কিত নানা রোগ এমন কি

তামাকের কণা শ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে গিয়ে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের কবলেও পড়তে হয় অনেককে।

এই যৎসামান্য আয় থেকে যেটুকু তারা আড়ালে সঞ্চিত করেছিল, তাও ধরা পড়ে গেল নোট-বন্দীর কালে। কত কথাই না তাদের শুনতে হলো!

শোষিত মেয়েরা যে প্রতিবাদ করবে তার সময় কোথায়? আবার প্রতিবাদ করলে তারা কাজ পাবে না। 'বাড়িতে বসে' যে দুপয়সা রোজগার করতে পারছে প্রতিবাদ করলে তাও পাবেনা। তাই আজও তারা নীরবে সহ্য করে এই অন্যায়। মেয়েরা কেবলমাত্র নিয়োগকাররীর শোষণের শিকার হন না, তাদের শিকার হতে হয় গার্হস্থ হিংসার, স্বামীর অত্যাচার মারধোর ইত্যাদিরও। সব সইতে হয় মুখ বুজে। এরা এতটাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করে যে ইচ্ছা থাকলেও ইউনিয়ন করতে পারে না। তাদের অধিকারের কথা বলার কেউ নেই।

বাড়ির বাইরে যারা কাজ করে তাদের জন্য সামান্য শৌচালয়ের ব্যবস্থাও নেই। ১০০ দিনের কাজে যে মেয়েরা কাজ করে তারা বাধ্য হন ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে মলমূত্র ত্যাগ করতে। কারখানা অথবা অফিসে কর্মরত মেয়েদের যে অবস্থা ভালো তাও কিন্তু বলা যায় না। যেখানে ৫০ জন মেযেকর্মী থাকলে ক্রেশের আইনী বিধান আছে সেখানে বেশীর ভাগ রাজ্যে মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়েতেও ক্রেশ নেই। যাদের এই নীতি কার্যকরী করার কথা তারাই তো আইন-কানুন মানছে না। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইন থাকলেও অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি (Internal Complaint Committee অথবা বিশাখা কমিটি) নেই। আরটিআই করে জানা গেছে যে আমাদের রাজ্যে বেশীর ভাগ কো-এড স্কুলে কোনো বিশাখা কমিটি নেই। এমনকি শিক্ষাবিভাগের জেলা ইন্সপেক্টরের অফিসেও যে কমিটি রয়েছে তাও আইন অনুযায়ী নয়।

বেশীরভাগ কোর্টে মেয়ে 'উকিল বাবু' দের জন্য শৌচালয় নেই। যেখানে আছে তা না থাকার মতো, ব্যবহারের অযোগ্য। দীর্ঘ সময় প্রসাব না যেতে পারা বা জল না খাওয়ার কারণে নানান রোগে ভোগেন তাঁরা। যে মেয়ে 'উকিল বাবুরা' নিগৃহীত মেয়েদের আইনী সুরাহা দেন, তারা নিজ কর্মস্থলের দীর্ঘ দিনের এই সমস্যা মেটাতে পারছে না। অসম্ভব পিতৃতান্ত্রিক ন্যায়িক পরিসরের কর্মক্ষেত্রে 'মেয়ে উকিল বাবুরা' কি হাসির খোরাক হবেন?

আমাদের রাজ্যে চটকল হচ্ছে সংঠিত ক্ষেত্রের এক বৃহৎ নিয়োগকারী। সেখানে বহু নারীশ্রমিক কাজ করেন। ছ'টি চটলকের এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে চটকলে তাদের অবস্থা খুবই করুণ। নারী শ্রমিকরা যৌন হেনস্থার প্রতিরোধের জন্য অভ্যন্তরীণ কমিটির সম্পর্কে কিছু জানেন না। রাজ্যের এমন একটিও চটকল নেই যেখানে এই মর্মে অভ্যন্তরীণ কমিটি আছে। চটকলগুলোতে রাতের শিফ্টে বহু মেয়ে কাজ করে অথচ তাঁদের আইনি কাঠামো তৈরী হয়নি আজও। মেয়েদের শৌচালয় নোংরা, গা ঘিন ঘিন করে। শৌচালয় ব্যবহার না করার তাদের সহজ উপায় হল, জল না খাওয়া আর নানা সংক্রমণকে ডেকে আনা। সাথে রয়েছে কম মাইনে ও বেশী কাজের সময়।

চা বাগানে অধিকাংশ শ্রমিক মেয়ে। চব্বিশটি চা বাগানে করা সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, চা বাগানের প্রায় ৮০ু নারী শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইনের বিষয় কিছু জানেন না। আইন থাকলেই যে যৌন হেনস্থা বন্ধ হয়ে যাবে তা আশা করা হচ্ছে না। কিন্তু সচেতনতা যে বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার অভ্যন্তরীণ কমিটি থাকলে নারী শ্রমিকরা সুপারভাইজর বা সহকর্মীর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনলে খাপ পঞ্চায়েতের মত সভা বসিয়ে অভিযোগকারিণীকে দোষারোপ করে তাকে ছাঁটাই বা বদলি করার প্রথায় ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটবে।

শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় তার 'চটকলের মেয়ে শ্রমিকরা ৭০ বছর আগে-পরে' শীর্ষক লেখায় লিখেছেন যে 'বললে হয়তো অনেকেই খেয়াল করবেন যে অনেক সময়য়ই চোখে পড়ে সাজানো গোছানো আলো যুক্ত ফ্ল্যাট বাড়িতেও সবচেয়ে ছোট এবং প্রায় অন্ধকার হয় তাদের রান্নাঘর, যেমন হতো পুরানো কালের মধ্যবিত্ত বাড়িতে। এটা যে অন্যায় তা কতজনে চিন্তায় আসে?'

সর্বশেষে, স্বাধীন রোজগার কি মেয়েদের স্বাধীন করেছে? মেয়েরা কি অমর্যাদাকর 'লক্ষীর ভান্ডারের ৫০০ টাকা' চায় নাকি কর্মসংস্থান? কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও কাজের সুস্থ পরিবেশ দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কাজ করা যে মেয়েদের অধিকার তা মানতে নারাজ আমাদের মধ্যে অনেকেই। উদ্যোগ নিতে হবে নারী ও পুরুষকে অর্থাৎ সমাজকে। আসলে এটা বোধের প্রশ্ন। গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত হবে যখন সবার জীবনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, সব ধর্মের, সব জাতের, সবার জীবন এক নতুন সমৃদ্ধতর চেতনার ইঙ্গিত বহন করবে।

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালে উন্নয়নের পথে (মাথাচারা দেওয়া) অসন্তোষ, অশান্তি এবং চরমপন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ জন বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞমণ্ডলী তৈরি হয়। ২০০৮ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টের অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।

১) নকশাল আন্দোলনের প্রধান সমর্থন আসে দলিত ও আদিবাসীদের মধ্যে থেকে। তাই এই অধ্যায় শুরু করা উচিত এই সামাজিক বর্গের অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত দিয়ে।

ভারতের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশই দলিত ও আদিবাসী। মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ দলিত ও ৮ শতাংশ আদিবাসী। তাদের বেশির ভাগই ৮০ শতাংশ দলিত এবং ৯২ শতাংশ আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দা। এদেশে গ্রামীণ দারিদ্রতার উচ্চ হার অবশ্যই তফসিলি জাতি ও উপজাতির চরম দুর্দশার দিকে নির্দেশ করে। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে বেশি গ্রামীণ- দারিদ্র অঞ্চল। এইসব রাজ্যে দরিদ্র এস সি- এস টির সংখ্যার উচ্চ অনুপাতের এটাও কারণ। এই পাঁচ রাজ্যে দেশের মোট এস সি জনসংখ্যার ৫৫.৮৭ শতাংশ থাকলেও দরিদ্র জনগণের ৭০ শতাংশ এরও বেশি এই পাঁচ রাজ্যের বাসিন্দা। এস টি-দের দুর্দশা আরও অবর্ণনীয়। সারাদেশের ৪৯ শতাংশ এস টি জনগণ এই রাজ্যগুলিতে বাস করে, অথচ দরিদ্র এস টি মানুষের ৬৩ শতাংশ বাস এই অঞ্চলে। তদুপরি নানা দিক দিয়ে অত্যাচার এবং ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চনার শিকার। সামাজিক, আইনি,রাজনৈতিক কোন অধিকারেরই স্বীকৃতি তাদের জোটে না।

বিভিন্ন জেলার সেন্সাস তথ্য খুঁটিয়ে দেখলে জানা যায় , খুব বেশি দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের বাস প্রধানত উত্তর অঞ্চলের রাজ্যগুলিতেই। এর পাশাপাশি তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্নাটকের কিছু পকেটে উচ্চমাত্রার দলিত মানুষের বাস আছে। যদিও কোথাও জনগণের মধ্যে দলিত এবং আদিবাসী অনুপাত ও সেই অঞ্চলে নকশাল প্রভাব এর মধ্যে কোন রৈখিক যোগসূত্র পাওয়া যায় না। তবুও বলতেই হবে, তাদের প্রভাবিত অঞ্চল সমুহে সাধারণত দলিত ও আদিবাসী জনঘনত্বের উচ্চ হারই বিরাজ করে। যদিও পাঞ্জাব, হরিয়ানা,গুজরাট, রাজস্থান এবং মধ ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে দেখা গেছে; বহু জেলাতে দলিত ও আদিবাসী জনসংখ্যা ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নকশাল প্রভাব তেমন নেই।

২) বঞ্চিত হয়ে সরে যাওয়ার কারণ দারিদ্র্য নিঃসন্দেহে। কিন্তু আরও অনেক কারণ, যেমন ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকারচ্যুত হওয়া, মানুষের মত মর্যাদা না-পাওয়া ইত্যাদিও মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ও তার মনে এই ধারণার জন্ম দেয় যে সুরাহা হতে পারে চালু ব্যবস্থা থেকে নয় বরং এই ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলেই। আরও কিছু কারণ থাকতে পারে। কোন কোন জায়গায় ব্যাপক অঞ্চলে জুড়ে ভীল বা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে। সেই জায়গাগুলি আপাতদৃষ্টিতে আপাতত শান্তিপূর্ণ মনে হলেও সজাগতা ও সচেতনতা (awareness and consciousness) ছড়িয়ে পড়লে এইসব অঞ্চলেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩) এদেশে দলিতদের দিনের পর-দিন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসুবিধা মোকাবিলা করতেই হচ্ছে। পাশাপাশি সহ্য করতে হচ্ছে নিয়ত অসম্মান, অমর্যাদা, অবদমিত করে রাখা, ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং হিংস্র নিষ্ঠুর আক্রমণের। ব্যাপক দারিদ্র্য তাদের দুর্দশাকে সূচিত করে। শিক্ষার সুযোগের অভাব, চাকরির সীমিত সুযোগ আর সব ক্ষেত্রেই প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়াত্ত এইসব কিছুই তাদের নানা রকম নিষ্ঠুর ও হিংস্র আক্রমণের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

৪) মানবাধিকার লঙ্ঘন— তপশীলি জাতির ওপর ব্যাপক হারে মানবাধিকার লঙ্ঘন, অপরাধ ও নিষ্ঠুরতা গ্রামীণ অঞ্চলে স্থায়ী নিয়মে পরিণত হয়েছে। ভোট দানের অধিকার বা সর্বসাধারণের জায়গায় প্রবেশের অধিকারের মত নাগরিক অধিকার গুলি, এক জায়গায় থেকে অন্যত্র যাওয়া বা শিক্ষার মতো সামাজিক অধিকার, সম্পত্তি মালিকানা, পেশা পাল্টানো, ব্যবসা করা, শ্রমিক ইউনিয়নের যোগ দেওয়ার মতো অর্থনৈতিক অধিকার সবকিছু থেকেই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে গ্রামীণ তপশীলি জনগণ বঞ্চিত হয়ে চলেছে চিরটা কাল।

তপশিলি জনগণের ওপরে নিষ্ঠুর অত্যাচার ও তাদের নাগরিক অধিকার হরণের সংখ্যা যা লিপিবদ্ধ হয়েছে ২০০৩ সালে ছিল ২৬,২৫২ টি, ২০০৪ সালে ২৬,৮৮৭টি এবং ২০০৫ সালে ২৬,১২৭ টি।

৫) দলিত সম্প্রদায়ের অন্তরের অসন্তোষের উৎস নিহিত আছে যুগ-যুগ ধরে চলে আসা জাতপাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ভেতরে। যা' তাদের বাধ্য করে সেই জীবনে পড়ে থাকতে যা শুধুই বঞ্চনা, অবদমন ও হীনতায় ভরা। ভারতীয় সংবিধান এবং বিভিন্ন আইন ও গৃহীত নীতি সমূহ এই অত্যাচার

বজায় রাখতে কাঠামোকে অবলুপ্ত করতে চেয়েছে, কিন্তু পরম্পরাগত সুবিধাভোগী বর্ণের অবৈধ প্রভাব ও হস্তক্ষেপে ওইসব ব্যবস্থা কার্যকরী হতে পারে নি।

৬) ১৯৮৮'র কুড়ি তম বিখ্যাত রিপোর্টে এস সি-এস টি কমিশনার দলিত ও তপশীলিদের ওপর হিংস্রতার তিনটি মূল কারণকে দায়ী করেছিলেন। এক) সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত সরকারি জমি এস সি-এস টিদের মধ্যে বন্টনে অসমাধিত সমস্যা। দুই) ঘোষিত minimum wages (ন্যূনতম মজুরি) নামমাত্র বা একেবারেই না দেওয়ায় উদ্ভূত তিক্ততা ও উত্তেজনা। তিন) সংবিধানের ঘোষণা ও তাদের জন্য তৈরি হওয়া কিছু আইন বলে এস সি-এস টি দের মধ্যে নিজ অধিকার ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ব্যাপারে সচেতনতার জাগরণ ও আত্মপ্রকাশে উচু বর্ণের মানুষের অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধ।

৭) সাধারণভাবে সর্বত্রই আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হতে-হতে বহু জায়গায় প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হচ্ছে। নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, আসাম, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, ছত্রিশগড়, মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা সর্বত্র আদিবাসীদের মনে বিচ্ছিন্নতা এবং বহিষ্কারের অনুভূতি গভীরভাবে চেপে বসছে। যার বহিঃপ্রকাশ নানা রূপে ঘটে চলেছে। The Report of the Expert Group on Prevention of Alieation of Tribal Land and its Restoration (oct-2004) নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে যে আদিবাসীদের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোটি নড়বড়ে ও দুর্বল সেটাই তাদের বঞ্চনা ও ক্ষমতাহীনতার মূল ভিত্তি।

৮) দারিদ্র এবং চিরস্থায়ী বঞ্চনা তো আছেই, তা ছাড়াও আদিবাসীরা যে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয় তার বহুবিধ কারণ বর্তমান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ গুলোর মধ্যে বলতে হয় শাসনব্যবস্থায় কোথাও নিজেদের চিহ্ন খুঁজে না-পাওয়া (absence of self governance), সরকারি অরণ্য নীতি, আবগারি পলিসি, জমি সংক্রান্ত ঘটনাবলী শোষণের নানান মুখোশ, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন, রাজনৈতিক প্রান্তিকিকীকরণ, জমি হারানো, জোর করে স্থানচ্যুত করা এইসব কারণও আন্দোলনে মানুষকে বাধ্য করে। তপশীল অঞ্চলে সুরক্ষা ধর্মী বিধিগুলি লাগু করার চূড়ান্ত ব্যর্থতা, সরকারিভাবে ধার দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা গড়ে না-ওঠায় সুদখোর মহাজন দের উপর নির্ভর করতে ও ফলস্বরূপ ঋণের ফাঁসে জমি হারানো এমনকি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের হিংস্রতায় সমস্যা গুলিকে গভীরতর করে।

বাস্তবত আদিবাসীদের দুরবস্থার জন্য অনেকটাই দায়ী এই ঘটনা যে, তারা মূলত বনাঞ্চলের বাসিন্দা। ২০০৩ সালের ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টের অনুসারে দেশের ৬০ শতাংশ ফরেস্ট কভার এবং ৬৩ শতাংশ ডেন্স ফরেস্টে পড়েছে। ১২৭ টি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা গুলিতে অর্থাৎ সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশীল ভুক্ত জেলা সমূহের ফলাফলের আদিবাসী অবস্থাকে প্রভাবিত করে। বাণিজ্যিক ও শিল্পগত কারণে কাঠ ও খনিজ সহ বনজাত সামগ্রির ব্যাপক মাত্রা ছাড়া লুণ্ঠন বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত করছে। যুগ যুগান্ত ধরেই আদিবাসীরা পরিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য কী-ভাবে বজায় রাখতে হয় তা' জানেন এবং জানেন বনভূমি বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা। তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের স্বার্থেই তারা জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে চান।

৯) গ্রামীণ অঞ্চলের মেয়েদের দমিয়ে রাখা সমাজ জীবনে গভীরতর পীড়া ও ফুঁসে ওঠার আর এক বড় কারণ। আইন নারী-পুরুষকে সমান অধিকার দিয়েছে। তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভারতীয় নারী সমাজকে সহ্য করতে হয় ব্যাপক দুর্দশা। সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে, কাজের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে, শিক্ষার সুযোগ পেতে, চিকিৎসা পাওয়ার সুবিধা বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব সব জায়গাতেই তারা বঞ্চনার শিকার। নারী পুরুষ অনুপাতের নিম্ন মাত্রার পাশাপাশি সাক্ষরতা হারের বৈষম্যে আছে। শ্রমশক্তির যোগানে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ কতটুকু? প্রসূতি মায়ের মৃত্যুহার এবং কন্যা ভ্রুনের হত্যার মতো লিঙ্গ নির্ভর সূচক গুলি এ দেশের মেয়েদের সংঘাতিক দুর্দশা কে ফুটিয়ে তোলে।

১০) ১৯৯৭ থেকে ২০০১ পর্যন্ত এস সি এস টি দের ওপর ঘটা অপরাধের হার জাতীয় এস সি এস টি কমিশনের ২০০৪ একটি বিশ্লেষণকারী রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন National Crime Record Bureau প্রকাশ করে।

এখানে বলা হচ্ছে ১৯৯৭ থেকে ২০০১ এর মধ্যে এস সিদের বিরুদ্ধে ১,২৭, ৯৩৩ টি হিংস্রতার ঘটনা ঘটেছে। বছরে গড়ে যার সংখ্যা ২৫,৫৮৭। এস টিদের ওপর এই সংখ্যা অনেক কম। এই সময়কালে এসটিদের উপর আক্রমণের সংখ্যা ২১,৪২৪ অর্থাৎ বছরে গড়ে ৪২৮৫ টি ঘটনা। নবগঠিত এস টিদের জন্য জাতীয় কমিশন নতুন তৈরি হয়েছে, তারা বলছে, ২০০১ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড়ের ট্রাইবালদের ওপর আক্রমণ ও নিষ্ঠুরতার ঘটনা চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০১ সালে ২০২১ টি, ২০০২ সালে ৩০১২টি, ২০০৩ সালে ২৫৫৩ টি এবং ২০০৪ সালে

২৮৪৩টি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ২০০৬ এর বার্ষিক রিপোর্টে মধ্য ভারতের এই অঞ্চলকেই সবচেয়ে + এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবস্থার কোন উন্নতি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

১১) এক সর্বব্যাপী জন-অসন্তোষ কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় সুস্থ সমাজ ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিচ্ছে। প্রায়শই এর পরিণতি রূপ পাচ্ছে অশান্তিতে, যা মাঝে মাঝেই হিংস্র হয়ে উঠছে। বঞ্চনার মোকাবিলায় বছরের পর বছর বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন আর সরকারি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তার প্রয়োগ প্রচেষ্টা চলছেই। কিন্তু অভিজ্ঞতা দেখা যাচ্ছে এইসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও অসন্তোষ ও অশান্তি বেড়েই চলেছে। জনগণের ব্যাপক অংশের কাছে ন্যূনতম বেঁচে থাকাটাই এখন সমস্যা।

১২) যেহেতু ভারতের নিয়োজিত শ্রমশক্তির শতকরা ৫৮ শতাংশ এখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কার্যের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে জমি হারানোই হচ্ছে দারিদ্র্যের মূল উৎস। স্বাধীনতার পর-পরই ভারত রাষ্ট্র জমি এবং জীবিকার মধ্যেকার যোগসূত্র চিহ্নিত করতে পেরেছিল এবং ভূমি সংস্কার শুরু করেছিল। ভূমি সংস্কারের মূল অংশ তিনটি, জমিদার প্রভৃতি মধ্যসত্ত্ব ভোগী বিলোপ, প্রজাস্বত্বের সুরক্ষা এবং সিলিং উর্ধ্ব জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ। কিন্তু বাস্তবে যত সময়ে গড়ালো ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়া দুর্বলতার হতে লাগলো এবং সরকারের এক অসমাপ্ত এজেন্ডা হিসেবে রয়ে গেল।

গরিব মানুষ জঙ্গল, চারণভূমি ও জলের উৎসের মতো সাধারন সম্পত্তির উপরেই বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে নির্ভর করে। এই প্রাকৃতিক গণসম্পদ গুলি মুনাফার উৎস হিসেবে দেখার প্রবণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল-নদী-জঙ্গল ইত্যাদি ক্রমশ গরিব মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে লাগলো।

১৩) ভারত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে, বর্তমানে বৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ এবং আগামী দিনে তা দুই অঙ্কের পৌঁছবে। কিন্তু সাদা চোখেই ধরা পড়ে যে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, শহর- গ্রামে, উচ্চবর্ণ ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে বৈষম্য বেড়েই চলেছে। সবাই বলছে চূড়ান্ত অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ এটাই। কিন্তু নীতি নির্ধারকদের টোটকা যেন অন্য কথা বলছে। যেহেতু সকলকে সমান সামাজিক মর্যাদা প্রদানের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি শিক্ষার দুই জগৎ, স্বাস্থ্যের দুই জগৎ, পরিবহনের দুই জগৎ, আবাসনের দুই জগৎ, আর এই দুই জগতের ব্যবধান ক্রমবর্ধমান। বিশ্বায়নের কালে সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেওয়ার সচেতনতা ও জীবনযাত্রায় মান বেড়েছে। কিন্তু তা আয়ত্ত করার লোক কমছে।

সংবিধানের অনুশাসন অনুযায়ী (Article 34) মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পদের পুঞ্জিভবন বন্ধ করতে হবে। কিন্তু নীতি নির্ধারকরা তা উপেক্ষা করে চলেছেন। যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ, রপ্তানি ও বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি তুলে দেওয়া এবং বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য দেশকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার দিকে একমুখী পরিবর্তন দরিদ্র জনগণের উপর অন্যতম আঘাত হিসেবে আসছে।

১৪) সংবিধানের উদ্দেশ্য ছিল শাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্যের ক্রম-হ্রাস। সাংবিধানিক এবং আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলি এই আস্থা নিয়ে গঠন করা হয়েছিল যে, সমস্ত প্রান্তিক মানুষের বৈধতা সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নেবে। কিন্তু, তারা যথোপযুক্ত সহায়তার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সমান অধিকার ও সমমর্যাদা কেবল সাংবিধানিক অধিকারই নয়, তা অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার। বিভেদ ও বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা,গার্হস্থ্য হিংসা এবং সমাজের দুর্বলতার অংশের বিরুদ্ধে অত্যাচারের যে সর্বব্যাপী প্রক্রিয়া চলছে, তা অবশ্যই দেশের অত্যাচারিত মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সূচক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

১৫) এই অবস্থায় চোখ কপালে তুলে কোন লাভ নেই যে জনগণের এক ব্যাপক অংশ ক্রুদ্ধ এবং তারা এই সমাজ কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করছেন। এই প্রসঙ্গেই বলতে হয় যে, অসন্তোষের বিবৃত কারণগুলি খুঁজে-খুঁজে চিহ্নিত করা এখন খুব প্রয়োজন। এবং প্রয়োজন সেই উপায় গুলোরও সন্ধান করা যাতে রাষ্ট্র এক মানবিক, বন্ধুত্বপূর্ণ ও যত্নশীল ভাবে উত্তর দিতে পারে। যদি এই ক্ষেত্রে নকশালাইট আন্দোলনের ওপরেই বেশি জোর পড়ে তার কারণ এই নয় যে অন্য ধরনের বিক্ষোভ গুলি কম গুরুত্বপূর্ণ। বরং বলা যায়, নকশালপন্থীরা সংগ্রামের যে পথ বেছে নিয়েছে সেই পথই তাদের মুখ্য ভূমিকা এনে দিয়েছে। এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হিংসা থাকবেই। আর চরমপন্থীরাও এই রাষ্ট্র হিংসাকেই তাদের সহিংস্র পদ্ধতির ন্যায্যতা হিসাবে দেখাতে চাইবে।

চরমপন্থী সন্ত্রাসের পথকে ছাড়পত্র না দিয়েই এর প্রতি সৎ সাড়া দেওয়ার মানে হবে সমাজে রাষ্ট্র হিংসাকেও উৎকর্ষতায় নিয়ে আসা (by amelio rating the structural violence in society)। সমাজে রাষ্ট্র-হিংসাকে কমিটির দায়িত্ব ছিল এই

সাড়া দেওয়া রেখাচিত্র তুলে ধরা এবং কী-কী-ভাবে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তার উপায় ঠিক করা।

১৬) দুর্ভাগ্যজনকভাবে অশান্তি-অসন্তোষ ও চরমপন্থা গ্রহণের অন্তর্নিহিত কারণগুলো কোনদিনই আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়নি অথবা তা প্রশাসনিক কিংবা বৌদ্ধিক স্তরেও তর্ক আলোচনার বিষয় হয়েই থেকেছে। মাঝে মাঝে খুব ঝাঁকি দেওয়া কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছাড়া কখনোও কোন স্থায়ী প্রশাসনিক বা উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়া নেওয়া হয়নি যাতে করে জনসাধারণের মধ্যেকার অসন্তোষের কারণগুলোর অবসান ঘটানো যায়। হয়তো অনেক আগে সরকার নিযুক্ত কয়েকটি কমিটি কিছু কাজ করেছিল। যাই হোক না কেন, আশির দশকের শেষ থেকে সরকারের দিক থেকে আর কোন রিপোর্টে এমন অনুসন্ধান হয়নি। *ক্রমশ*

শিক্ষার অধিকার ও আজকের জাতীয় শিক্ষানীতি

শাহানারা খাতুন

একটা চরম সংকট আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। প্রাত্যহিক সংবাদ শিরোনামে বিষয়টি প্রতিদিনই স্থান পাচ্ছে, শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষানীতি। একটা বিষয় প্রতিদিন সংবাদ শিরোনামে আসার অর্থ, বহুচর্চিত, বহু আলোচিত হওয়ার অর্থ সেটা হয় খুব সুফলপ্রসূ; নয়তো সংকটে আছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই হয়েছে। শিক্ষা যে সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে গত কয়েক বছর ধরে আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারছি। কারণ, অতিমারীজনিত সংক্রমণের দোহাই দিয়ে যখন দিনের পর দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো বন্ধ করে রাখা হলো আমরা তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, আমরা যাঁদের নির্বাচিত করে লোকসভা বিধানসভায় পাঠিয়েছি তাঁরা চান না শিক্ষা সর্বজনীন হোক। রাষ্ট্র তার নাগরিকের শিক্ষার দায়িত্ব নিক। যদি চাইতেন তাহলে স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও; গালভরা নাম স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসব' পালন করার পরেও শিক্ষা মৌলিক অধিকারের তালিকার আওতায় রাখা হত; বাইরে রাখা হত না।

শিক্ষার অধিকারের ১০০ বছর যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো, ব্রিটিশ সরকার যেমন বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে চায় নি। তেমনই আমাদের সংবিধান সভা/ সংবিধান সভার কমিটি/ সংবিধান সভার পরামর্শ কমিটি স্বাধীন ভারতে বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের দাবি থেকে বাতিল করে। শিক্ষার অধিকারকে অবিচারযোগ্য মৌলিক অধিকারের তালিকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। যা পরে রাষ্ট্রের পরিচালক নীতি (৪৫ নং ধারা) হিসেবে পরিচিত হয় । শুধু তাই নয়, সংবিধান সভায় বিতর্কের সময় ৩৬ ধারার প্রথম লাইনটি পাল্টে দেওয়া হয়। প্রথমে ঐ লাইনটি ছিল, 'প্রতিটি নাগরিকের বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো... ইত্যাদি।' রাষ্ট্রের কর্তব্যের জায়গায় লেখা হল ক্ষ্ম রাষ্ট্র চেষ্টা করবেক্ষ্ম। বদলে দেওয়া হল প্রাথমিক শিক্ষা শব্দটিও। সংবিধানের ১৮ ধারায় রাখা হল ১৪ বছরের কম বয়সী কোন শিশুকে যদি খাটানো না হয় তাহলে তারা ঐ সময়টা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সময় কাটাবে। রাষ্ট্র চেষ্টা করবে যাতে এই সংবিধান চালু হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছরের কমবয়সী সব শিশুকে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া যায়। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মরল। শিক্ষা আর বিচারযোগ্য বিষয়ও থাকল না। আর আজ পর্যন্ত রাষ্ট্র তার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করল না। রাষ্ট্রে শিক্ষাকে অবাধ সর্বজনীন করার জন্য আজ পর্যন্ত স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করল না। শিক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য বা ১৯৮৬ জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়নের জন্য দেদার অর্থ সহায়তা নিল এমন সব সংস্থা থেকে যাদের কাছে আমার রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার টিকি বাঁধা হয়ে গেল।

১৯৯৩ সালের উন্নিকৃষ্ণান ও অন্যান্যরা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে একটি অধিকার হিসেবে গণ্য করে বলেন, তএদেশের নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ২১ ধারা থেকে এই অধিকার জন্মায়। কিন্তু এটি চরম অধিকার নয়। এর অন্তর্বস্তু ও প্রয়োগ ৪৫ এবং ৪১ ধারা দ্বারা নির্ধারিত। অন্য কথায় প্রতিটি শিশু/ নাগরিক ১৪ বছর বয়স অবধি বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী। তবে তা রাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্গতির উপর সীমাবদ্ধ।ক্ষ্ম এরপর দেশব্যাপী শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করার দাবি উঠলে ২০০২ এর ৮৬ তম সংশোধনী গৃহীত হয়। যুক্ত হয় নতুন ধারা ২১ (ক)। তা'তে বলা হয়, রাষ্ট্র ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সব শিশুর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে করবে যা রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্থির করবে। ৪৫ ধারার জায়গায় নতুন অন্তর্ভুক্তি হল ত্ত রাষ্ট্র ৬ বছরের কমবয়সী শিশুদের শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

ফাঁক থেকে গেল এখানেই। চেষ্টা করা, আইনের দ্বারা স্থির করার ফাঁক গলেই বেরিয়ে এল আজকের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি। যা লাগু করার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক এবং স্বয়ং

রাজ্যপাল মাঠে নেমে পড়েছেন। ইউনিভার্সিটি গুলোর দরজায়-দরজায় ঘুরছেন ২০২৩ থেকেই চালু করার আবেদন নিয়ে। ২০২০ তে যে নতুন শিক্ষানীতি আসবে তা ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ শিক্ষার অধিকার বিলে ইঙ্গিত দেওয়া ছিল। আমরা ধরতে পারিনি। ২০১০ এর ১ লা এপ্রিল থেকে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় তাতে ২০২০ পর্যন্ত একটা স্তরে অর্থাৎ কাঙ্খিত মানে পৌঁছানোর কথা ছিল। এরপর কী-হবে বলা ছিল না। সেই 'না-বলা বাণীর ঘন যামিনী'র মধ্যেই লুকিয়ে বেড়িয়ে এল নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি। UDA, SIDA, WORLD BANK এর টাকায় চলা শিক্ষা নীতি ধীরে-ধীরে বেসরকারিকরণের পথে চলে গেল। যে রাষ্ট্র লোকসান দেখিয়ে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দেয় সে অর্থের অসঙ্কুলান দেখিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মাথা থেকে হাত তুলে নেবেই। UDA, SIDA, WORLD BANK এর টাকায় গড়ে ওঠা খোড়ো ঝড়ো স্কুল -বাড়িগুলো আজ চকচকে হয়েছে। ওগুলো ওদের দোসর দের হাতে যাবেই। ৮২০৭ টা স্কুল আজতুলে দেওয়ার তালিকা ভুক্ত। আগামী দিন বাকি গুলোও হবে। কারণ, ২০১০ RTE Act অনুযায়ী চার ধরনের স্কুলের কথা ছিল। ১) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের টাকায় চলে এবং তাদের পরিচালিত। ২) বেসরকারি কিন্তু সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রাপ্ত। ৩) বিশেষ ধরনের স্কুল যেমন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক স্কুল, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ স্কুল এবং এই ধরনের স্কুল। ৪) বেসরকারি স্কুল যারা সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো সাহায্য পায় না। এও বলা ছিল সরকারি বা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল থাকবে। তবে তার মাত্র দশ শতাংশ স্কুলকে উন্নীত করা হবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বা নবোদয় বিদ্যালয়ের মতো। যা আজকের জাতীয় শিক্ষানীতির cluster school।

প্রাইভেট স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে সংবিধানের ১৯ সি এবং জি ধারাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল— 'সভা সমিতি গঠনের অধিকার' এবং 'যে কোনো পেশা অনুসরণ করা বা ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার' নাগরিকের আছে। আইনের বুড়ো আঙুলের ফাঁক গলে গড়ে উঠল ব্যাঙের ছাতার মত বেসরকারি স্কুল। সৈনিক স্কুলের নামে নিজস্ব এজেন্ডা পূরণের লক্ষ্যে সংঘীয় স্কুল। 'রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান' এর নাম করে স্কুলের সব সম্পত্তির মালিক এখন সরকার বা রাষ্ট্র। তাই তো নামখানার স্কুল বিক্রি হয়ে যায়। এক একটা সময় আসে এক এক বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করে আমরা ঝিমিয়ে পড়ি। আর ঝিমোনোর সুযোগে বিক্রি হয়ে যায় আমার অধিকার।

শহীদ ফাদার স্ট্যান স্বামীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার সব প্রমাণই সাজানো, মিথ্যা

অজেয় পাঠক

''গোপনীয়তার অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে শয়তানের রাজত্ব তার দুষ্ট-অভিপ্রায় নিয়ে সর্বগ্রাসী অভিযান চালায়''— দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের এই অমোঘ উক্তি সেই প্রাচীন কাল হয়ে আজকের এই আধুনিক যুগেও বার-বার সত্যে প্রমাণিত হচ্ছে। সেইসঙ্গে বার-বার প্রমাণিত হচ্ছে এই অমোঘ সত্য , আজকের যুগে 'মানব কল্যাণকামী শাসন'বলে কিছু হয়না, আসলে সব রাজত্বই 'শয়তানের রাজত্ব'। এবং সেই শয়তান বা পরাক্রমী রাজা নাগরিকদের নিজের তাঁবেদার বানিয়ে রাখতে সবরকম দমন পীড়নের রাস্তা অবলম্বন করেন। যারা তাঁর তাঁবেদার হতে অস্বীকার করবে অথবা প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রদর্শন না করে রাজশক্তির চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করবে, তাদেরকে রাজদ্রোহী বানিয়ে কারাগারে আটক করতে রাজাই তৈরি করবেন ভুয়ো নথি আর মিথ্যা প্রমাণাদি। তারপর সেই মিথ্যচারের সাহায্যেই বিচারপদ্ধতিকে ব্যবহার করে প্রতিবাদী কণ্ঠকে গরাদবন্দী করে বিচারের নামে প্রহসন চলবে দিনের পর দিন। বন্দী থাকতে থাকতে একদিন প্রাণশক্তি শেষ হবে সেই প্রতিবাদীর, রাজ কারাগারেই তাকে মরতে হবে। সেই পরিণতিই হয়েছিল অশীতিপর খ্রিস্টান পাদ্রী ফাদার স্তানিস্লাস লুরদুস্বামীর, ফাদার স্ট্যান স্বামী নামেই যাঁকে চিনতেন এদেশের নিপীড়িত জনজাতির মানুষেরা, যাঁদের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল ফাদার স্ট্যানের জীবন। সেজন্যই ৫ জুলাই ২০২১ এই ''মহান, গণতান্ত্রিক'' ভারতরাষ্ট্রের (বিচারবিভাগীয়) হেফাজতে জীবন দিতে হয়েছিল প্রান্তিক জনজাতির জীবন-জীবিকার অধিকার রক্ষার লড়াই-এ নিবেদিত প্রাণ এই ''ফাদার''-কে।

রাষ্ট্রের রোষানলে পড়ে ২০২০ সালের ৮ অক্টোবর রাঁচি শহরে তাঁর বাসস্থান বাগাইচাদ থেকে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ-এর হাতে। তাঁর বিরুদ্ধে পুনার ''ভীমা কোরেগাঁও'' তে এলগার পরিষদের দ্বারা আয়জিত কর্মসূচীতে যুক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছিল। সেই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা সম্প্রতি তার প্রমান পাওয়া গেছে। ফাদার স্ট্যান স্বামীকে অপরাধী প্রমাণ করতে তাঁর কম্পিউটারে দূর নিয়ন্ত্রিত গোপন সফটওয়্যার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঢোকানো হয়েছিল দেশদ্রোহীতার ভুয়ো প্রমাণ এবং সেই মিথ্যা প্রমাণ বানাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে

কেনা হয় গুপ্তচরবৃত্তিতে কার্যকারী কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার। গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২২, আমেরিকার বোস্টন শহরের আর্সেনাল কন্সাল্টিং নামক সংস্থা মৃত ফাদারের ব্যক্তিগত কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক পরীক্ষা করে এই তথ্য জানিয়েছে। গতবছর এই একই সংস্থা জানিয়েছিল যে ভীমা কোরেগাঁও মামলায় বন্দী সমাজকর্মী রোনা উইলসন এবং আইনজীবী সুরেন্দ্র গ্যাডলিং, এর বিরুদ্ধেও একইভাবে ভুয়ো প্রমাণ তৈরি করা হয়েছিল এবং তাঁদের ব্যক্তিগত কম্পিউটারের সেই প্রমাণ গোপনে স্থাপন করা হয়েছিল। আর্সেনাল জানিয়েছে যে ২০১৪ সালের ১৯ অক্টোবর প্রথমবার হ্যাকার বা সাইবার আক্রমণকারীরা ফাদার স্ট্যান স্বামীর কম্পিউটারে হ্যাক বা গোপন অনুপ্রবেশ করে। তারপর থেকে ২০১৯ সালের ১২ জুন তাঁর কম্পিউটার পুনে পুলিশ দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়ে-পর্যন্ত আরও দুইবার সাইবার হানায় আক্রান্ত হয়। এই হানাদাররা ফাদার স্ট্যান স্বামীর সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য গোপনে সংগ্রহ করেছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর কাজকর্মের উপর নজরদারি চালানো এবং কিছু তঅপরাধমূলকদ তথ্য তাঁর কম্পিউটারে রোপণ করা। শুধু ফাদার স্ট্যান স্বামী নন, ভীমা কোরেগাঁও ও অন্যন্য মামলায় রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে ভুয়ো প্রমাণ তৈরি করতেও সচেষ্ট এই হ্যাকাররা।

২০২২ এর ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরের সাইবার গবেষণা সংস্থা সেন্টিনেল ওয়ান জানিয়েছিল ফাদার স্ট্যান স্বামীর সহবন্দী রোনা উইলসনের ব্যক্তিগত কম্পিউটারে যে দুই হ্যাকার বাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল, তাদের মধ্যে একটি হ্যাকারকে ভারতরাষ্ট্রের 'সুরক্ষার' স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের পুণা পুলিশ এবং এই ধরণের হ্যাকারদের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে এবং এই হ্যাকাররা রোণা উইলসন, তেলুগু কবি ভারভারা রাও এবং দিল্লি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিক্ষাবিদ হানি বাবুকে দেশদ্রোহী সাজাতে তাঁদের ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ভুয়ো প্রমাণ রপ্তানি করেছে ২০২২ সালের জুন মাসে। আমেরিকার তঅয়্যারডদ পত্রিকা একথা জানিয়েছিল। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল এবং কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইবার সুরক্ষা সংস্থা সিটিজেনস ল্যাব বলেছিল, ৯ জন মানবাধিকার কর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য হাতাতে কয়েকটি গোপন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম বা স্পাইওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছিল।

২০২২ সালের ২৮ জানুয়ারি, নিউ ইয়র্ক টাইম্স পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ 'দ্য ব্যাটেল ফর দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট পাওয়ারফুল সাইবার ওয়েপন' থেকে জানা যায় যে ২০১৯ সালে ভারত সরকার ইজরায়েলের গুপ্তচর সফটওয়্যার বা স্পাইওয়্যার নির্মাতা এন এস ও-এর তৈরি স্পাই সফটওয়্যার কুখ্যাত 'পেগাস্যাস' ক্রয় করেছিল। নিবন্ধটি আরও জানাচ্ছে যে ২০১৭ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন ইজরায়েল সফরে যান তখনই এই তপেগাস্যাসদ ও কিছু যুদ্ধাস্ত্র কেনার চুক্তি করে এসেছিলেন ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের বিনিময়ে। 'পেগাস্যাস' ক্রয় যে ডিজিটাল নজরদারি বা গুপ্তচরবৃত্তির উদ্যেশ্যেই ছিল সেটা বলাই বাহুল্য, যদিও কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ দেশের নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের গোপন নজরদারির সমস্ত বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ফাদার স্ট্যান স্বামীর বিরুদ্ধে বানানো ভুয়ো প্রমাণ সংক্রান্ত বিষয়ে আর্সেনাল সংস্থার সাম্প্রতিক দাবী যে সঠিক সেটা নিশ্চিত করেছেন ওয়াশিংটন ডিসি'র সাইবার সিকিউরিটি সংস্থা ভলেক্সটির ডিজিটাল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ রবার্ট যান মোরা এবং ইতালিয়ান সাইবার সুরক্ষা সংস্থা সার্টেগো-র ডিরেক্টর আলেসান্দ্রো ডি কার্লো। মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট-এ এঁদের বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে।

ফাদার স্ট্যান স্বামীকে মরতেই হতো, কারণ তিনি ঈশ্বরের ফেরেস্তা সেজে রাজশক্তির গুণগান গাইতেন না। তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন কর্পোরেট লুঠেরাদের দ্বারা এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদের অবাধ লুণ্ঠনের। নিপীড়িত মূল নিবাসীদের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি সাহায্য করছিলেন। তাই ভুয়ো প্রমাণ সাজিয়ে তাঁকে দেশদ্রোহী সাজিয়ে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রেখে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল এদেশের শাসকেরা। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ফাদার তাই একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ''মনে রাখতে হবে যে, আমরা অপরাধী কারণ, আমরা দরিদ্রের চেয়েও দরিদ্রতম মানুষদের অধিকারের কথা বলছিলাম, শুধু ঝাড়খণ্ডেই নয়, সারা দেশ জুড়ে।''

তথ্যসূত্র—

১. Evidence plant trace on Stan Swamy's computer, The Tegegraph, ১৪.১২.২০২২

২. ''আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে সাজানো'' ফাদার স্ট্যান স্বামীর বিবৃতি, ০৩/০৯/২০১৮

৩. The Battle for the World's Most Powerful Cyberweapon, New York Times, ২২.০১.২০২২

তথ্যানুসন্ধান

ভীমপুর থানার অধীন গোবিন্দপুর ও ডিগরি গ্রামের দুই যুবককে জাল টাকা রাখার 'অভিযোগে' বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হল তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

গত ১৫/০৩ তারিখ ভীমপুর থানার পুলিশ রাত নটা নাগাদ তরুণ মন্ডল (২৪) নামে এক স্থানীয় যুবককে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারির কথা তার পরিবারকে জানানো হয়না, কোনো অ্যারোস্ট মেমো, সিজার লিস্ট দেওয়া হয়না। রাত এগারোটা নাগাদ স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে তরুণ মন্ডলের পরিবারের লোক থানা য় দেখা করতে গেলে তাদের দেখা করতে দেয়না ভীমপুর থানার পুলিশ। উপরন্তু অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে থানা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তরুণের পরিবার এপিডিয়ার কৃষ্ণনগর শাখার সাথে যোগাযোগ করলে শাখার পক্ষ থেকে থানায় জানতে চাওয়া হয় কোন অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণ মন্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। থানার ডিউটি অফিসার জানান ঐ নামে কাওকে আটক/ গ্রেপ্তার করা হয়নি। ঐ দিন রাত তিনটের সময় ভীমপুর থানার পুলিশ তার বাড়ি গিয়ে পরিবারকে জানায় এবং স্বীকারোক্তি আদায় করতে চায় যে জাল নোট রাখার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ।কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ন *অসত্য বলে তার পরিবার ঐ স্বীকারোক্তিতে সই করেননি । তরুণ তার পরিবারকে জানায় , ভীমপুর থানায় তাকে *প্রচন্ড শারীরিক নির্যাতন করা হয় , এবং পুলিশ তার হাতে বলপূর্বক *দশ হাজার (২০শ্র৫০০) জাল নোট ধরিয়ে দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করে । ঠিক এর পরের দিন একই অভিযোগে গ্রেপ্তার করে সংগ্রামী কৃষক মঞ্চের প্রাক্তন সম্পাদক মানিক বিশ্বাসকে । একই অভিযোগ, একই *প্রকার স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রক্রিয়া চলে মানিকের ক্ষেত্রেও। এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে কৃষ্ণনগর শাখা মনে করছে, এই গ্রেপ্তারি সম্পূর্ণ বে আইনি এবং *শাসকদল ও প্রশাসনের ষড়যন্ত্র । তথ্যানুসন্ধান দল গাতরা আর *ও পি তে গ্রেপ্তারির বিষয়ে জানতে গেলে এবং তরুণ মন্ডলকে দীর্ঘ চার ঘন্টা কোথায় রাখা হয়েছিল জানতে চাইলে আর ও পি ইনচার্জ এককথায় নিরুত্তর থাকেন এবং ভীমপুর ও সি এর সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। এরপর ভীমপুর থানায় যাওয়া হলে দেখা যায় থানায় তিনি নেই। ফোনে জানান যে, ঐ চার ঘন্টার হিসেব আর ও পি থেকে নিতে। স্পষ্ট হয় তাদের অস্বস্তি ও অস্বচ্ছতা। গত ২৪/০৩ নদীয়া এস পি এর কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং এই গ্রেপ্তারির সাথে যুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়।

আমাদের পর্যবেক্ষণ—

কেন এই গ্রেপ্তার বে আইনি?—১) গ্রেপ্তারের সময় অ্যারেস্ট মেমো, সিজার লিস্ট ও একজন সাক্ষী রাখা আইন মতে সিদ্ধ। পুলিশ এর কোনোটাই গ্রেপ্তারের সময় করেনি। ২) গ্রেপ্তার/আটক হওয়া ব্যক্তির তথ্য যা পুলিশ প্রথমে আটক/ গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির পরিবারকে জানাতে বাধ্য— পুলিশ তা জানায়নি। ৩) থানা হেফাজতে নির্যাতন ও জোর করে ,ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়, যা সম্পূর্ন বেআইনি— পুলিশ তাই করেছে।

ভীমপূর থানার পুলিশ মিথ্যে অভিযোগে (গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি ও তার পরিবারের কথা অনুযায়ী) গ্রেপ্তার করেছে তরুণ মন্ডল ও মানিক বিশ্বাসকে।

কেন এই গ্রেপ্তারি?— সংগ্রামী কৃষক মঞ্চ গ্রামে খেলার মাঠ দখল, খাস জমি দখল, পুকুর বুজিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করে বলে আমরা জানি। আমরা জানি, শাসক দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত গ্রামবাসীরা নিজের ভিটে মাটি থেকে উৎখাতিত হয়েছে তাদের ঐ জমিতেই পুনঃস্থাপন করার কাজটি ও করে। ফলত, একদিকে যেমন এলাকায় তাদের জন ভিত্তি আছে অন্যদিকে শাসকদলের রোষানলেও আছেন এই সংগঠনের সদস্যরা। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। শাসকদলের রোষানলে আজ আসলে তাদের জনভিত্তি। আর তাই এই বে আইনি গ্রেপ্তারি ও মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে কৃষক সংগঠনের কর্মীদের। এমনটাই তথ্যানুসন্ধান দলের মনে হয়েছে।

বেআইনি গ্রেপ্তারি, থানা হেফাজতে নির্যাতন আজ রাজ্য পুলিশের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ভোররাতে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির বাড়ি বা গ্রেপ্তার করতে যাওয়া র ঘটনা ও আজ পুলিশের এক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কার্যত ভীমপুর থানা সহ রাজ্য পুলিশ আজ শাসক দলের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। রাজনৈতিক কর্মীদের জাল নোটের অভিযোগে ফাঁসানোর মাধ্যমে ক্ষুন্ন করছে তাদের সামাজিক মর্যাদা।

তথ্যানুসন্ধান দলের পক্ষে ছিলেন তাপস চক্রবর্তী, অমিতাভ সেনগুপ্ত, কিশোর সিংহ রায়, মৌতুলি নাগ সরকার

বাজী কারখানায় মৃত্যু

গত পরশু অর্থাৎ ২০,৩,২০২৩ রাত আটটা নাগাদ মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত পুটখালীতে একটি বাড়িতে বাজী তৈরী হচ্ছিল। হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়ে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বাড়িটি তছনছ হয়ে যায়। এবং বাড়ির বাঃ কারখানার মালিক ভরত হাতির স্ত্রী লিপিকা হাতি, ছেলে শান্তনু হাতি এবং পাশের বাড়ির একটি মেয়ে আলো দাস ভয়ানক ভাবে ঝলসে যান। এত বাজি সেখানে ছিল যে স্থানীয় বাসিন্দারা এগোনোর সাহস পাননি। ভরত হাতি সেই সময়ে পাশের পুকুর থেকে জল আনতে যান বলে বেঁচে যান। প্রথমে পাশের পুকুর থেকেই জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। পরে মহেশতলা থানার পুলিশ আসে, দমকলও আসে। কিন্তু রাস্তা ছোট বলে প্রথমে দমকল ঢুকতে পারে নি। পরে অবশ্য আগুন নেভানো হয়। পরে আহত তিনজনকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এই বাজি কারখানাগুলো অসংগঠিত এবং বহু জেলা থেকে নাবালক শ্রমিক কাজ করতে আসে। অত্যন্ত অভাব এবং খিদের কাছে পরাস্ত হয়ে বাধ্য হয়ে বিপদ আছে জেনেও এই কাজে বাবা মায়েরা ছেলেদের পাঠান। এদের কোনো জীবনবিমা নেই, কোন নির্দিষ্ট মজুরি নেই, ঐ বারুদের স্তূপের মধ্যেই সারাদিন এমনকি রাত্রিবাস ও করতে হয়।থানা, পুলিশ, প্রশাসন সব জেনেও নির্লিপ্ত। অনেক শিশু শ্রমিক বহুবার বিস্ফোরণে মারা গিয়েছে। এই অঞ্চলে প্রতিবছর কোন না কোন বাজির কারণে দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু এই মৃত্যুমিছিল আটকানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে রকম সদর্থক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি।

হুগলী জেলার দশঘরায় রতন কোল্ড স্টোর থেকে গ্যাস লিক ও উদ্ভুত পরিস্থিতির তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

গত ০৭/০৩/২০২৩ রাতে হুগলী জেলার দশঘরায় একটি হিমঘর থেকে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস নির্গত হওয়ার পরে এলাকায় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি উদ্ভব হয়। এই সংবাদ গোচরে আসার পরে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির হুগলী জেলা কমিটির একটি তথ্যানুসন্ধানী দল ০৯/০৩/২০২৩ তারিখে ঐ এলাকায় যায় এবং দশঘরা সিনেমাতলা, ঘোষপাড়া, বাউরীপাড়ার অধিবাসীদের এবং হিমঘরের (রতন কোল্ড স্টোর) ম্যানেজার ও মেকানিকের সাথে কথা বলে।

ঘটনাক্রম ঃ- ০৭/০৩/২০২৩ রাত ৮-২০ নাগাদ রতন কোল্ড স্টোর থেকে প্রচুর গ্যাস লিক করা শুরু হয়। স্থানীয় অনেকেই ঐ হিমঘরে কাজ করার সুবাদে অল্প সময়ের মধ্যেই জানতে পারে গ্যাস লিক করছে। ইতিমধ্যেই লোকজনের শ্বাসকষ্ট এবং চোখ জ্বালা করতে শুরু হয়েছে। আতঙ্কিত মানুষজন পরিত্রাণের আশায় ঘরবাড়ী অরক্ষিত রেখে এলাকা ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে বাধ্য হন। রাত ১২টা ১২-৩০ নাগাদ তাঁরা ফিরে আসেন। আনুমানিক ১২০০ মানুষকে এলাকা ত্যাগ করতে হয়েছিল। তথ্যানুসন্ধানী দল চিকিৎসা চলছে এমন তিনজন অসুস্থ মহিলা এবং একজন অল্পবয়সী মেয়ের সাথে কথা বলে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। অবশ্য ০৭/০৩/২০২৩ রাতে ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে কিছু স্কুল বাড়ী ও ফাঁকা গুদামে মানুষজনকে সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হিমঘরে রেফ্রিজারেন্ট হিসাবে অ্যামোনিয়া ব্যাবহার করা হয়। এটি একটি বর্ণহীন অত্যন্ত বিরক্তিকর গন্ধযুক্ত তীব্র শ্বাসরোধকারী গ্যাস। এটি জলে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ তৈরি করে যা শরীরে জ্বালা এবং পোড়া তৈরি করতে পারে। রতন কোল্ড স্টোরের ম্যানেজার হরেন্দ্র নাথ পাত্র বলেছেন যে গ্যাস লিক অতি সময়ের মধ্যেই বন্ধ করা গিয়েছিল। দমকল ও স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ এসে অবস্থা আয়ত্তে আনে। এলাকার মানুষের কোনো ক্ষতি হয় নি। হিমঘরের মেকানিক উজ্জ্বল কুমার মণ্ডলের সাথে কথা বলে জানা গেছে তার কোনো কারিগরি শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই।

"Licensing Officer" means the Director of Agriculture including the Additional Director of Agriculture (Marketing), West Bengal and also District Magistrates within their respective districts empowered by the Director of Agriculture in this behalf (The West Bengal Cold Storage (Licensing and Regulation) Act, 1966).

লাইসেনসিং অথরিটি হিসাবে ডাইর্কেটরেট অফ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং-এর দায়িত্ব হিমঘরগুলির নিয়মিত পরিদর্শনের। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মতে এই নিয়মিত পরিদর্শন সঠিক ভাবে হলে এই ধরণের দূর্ঘটনা অনেকাংশেই এড়ানো সম্ভব।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির একটি দল ১৭/০৩/২০২৩ তারিখে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচারাল (মার্কেটিং), হুগলী-এর সঙ্গে দেখা করে। তার

সঙ্গে নিম্নরূপ আলোচনা হয়।

• এগ্রিকালচারাল (মার্কেটিং), হেডকোয়াটার্স, এর নির্দেশে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গ্যাস লিকের ঘটনার তদন্ত করেছেন এবং তার রির্পোট জমা দিয়েছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচারাল (মার্কেটিং), হুগলী সেই রির্পোট অফিসিয়ালি দেখেন নি, তাই কিছু বলতে পারবেন না।

• গ্যাস লিক ঘটনার ক্ষেত্রে হিমঘর মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করার কোন আইনী অধিকার ডাইর্কেটরেট অফ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং-এর নেই। এক্ষেত্রে আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, সমিতির যুক্তির সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচারাল (মার্কেটিং), হুগলী সহমত হন।

• গ্যাস লিকের পর হিমঘর মালিকের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষজনের খোঁজখবর করা উচিত ছিল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর একথা মেনে নেন কিন্তু এটা জানান যে এক্ষেত্রে হিমঘর মালিককে সর্তক করার আইনী অধিকার তার নেই।

• গ্যাস লিকের পর স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয় নি-এই বিষয় নিয়ে তিনি কোন মন্তব্য করতে চাননি।

• তিনি জানান যে হিমঘরে অবশ্যই উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মেকানিক নিযোগ করতে হবে,এমন কোন আইনী ধারা নেই।

• অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচারাল (মার্কেটিং), হুগলী জানান যেহেতু হিমঘরের লাইসেন্স পুর্ননবীকরণের আবেদন বিবেচনা করার জন্য বছরের বিভিন্ন সময় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে বিভিন্ন হিমঘর পরিদর্শন করতে হয় এবং সেই সময় তিনি আশপাশের হিমঘরগুলিও পরিদর্শন করে নেন, সেই কারণে খুব নিয়মিতভাবেই জেলায় হিমঘরগুলি পরিদর্শনের কাজটি সম্পন্ন হয়।

পর্যবেক্ষণ

১) হিমঘরের মালিকেরা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন মেকানিক নিযোগ করে না।

২) ডাইরেক্টরেট অফ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সঠিক ভাবে নিয়মিত পরিদর্শন করে না।

৩) স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতা এবং এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের মদতে (অবশ্যই তোলার বিনিময়ে) হিমঘরের মালিকেরা বেপরোয়া।

৪) প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় মেডিক্যাল দল পাঠানো উচিত ছিল।

৫) হুগলী জেলার সিঙ্গুর, তারকেশ্বর, দশঘড়া জাঙ্গীপাড়া অঞ্চলে প্রচুর হিমঘর আছে। যে কোনো সময়ে যে কোনো হিমঘরে এই ধরণের গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটতে পারে।

আমাদের দাবী

১) প্রতিটি হিমঘরে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন মেকানিক নিয়োগ করতে হবে।

২) হিমঘরগুলির সঠিক ভাবে নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।

৩) সমস্ত দূর্ঘটনার এফ আই আর করে সঠিক ভাবে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্যানুসন্ধানী দলঃ অমল রায়/কমল দত্ত/ কল্যাণ আদক (তারকেশ্বর গ্রীনমেটস)/ জয়দেব দাস/ বাপী দাশগুপ্ত

নরেন্দ্রপুর থানা লক-আপে হত্যা

আবারও পিটিয়ে খুন থানা লক আপে! এবারও সেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানা! বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনস্থ এই থানার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে মারধর, বন্দীদের পেটানো এবং আসামিদের পিটিয়ে পরিবারের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আছে! দক্ষিণ ২৪ পরগনার কলকাতা লাগোয়া নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করেছিল, তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এস আই অর্ণব চক্রবর্তী। এবারও গড়িয়ার ৩২ বছরের এক তরতাজা যুবককে কোন অভিযোগ ছাড়াই গ্রেফতার করা হয় ১৩ এপ্রিল,'২৩, দুপুর নাগাদ। এমনটায় বলছেন, পরিবারের সদস্যরা। কোনও কাস্টোডি মেমো বা বাড়ির লোকদের জানানো কোনটাই করা হয়নি! বাড়ির লোক খোঁজ করতে-করতে লোকমুখে খবর পেয়ে থানায় বন্দি সুরজিতকে আবিষ্কার করেন।

সুরজিৎ সর্দার বছর ৩২-এর যুবক। বাস গড়িয়া থেকে মিনিট সাতেক হাঁটা পথে গলির মধ্যে দোতলার একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে সুরজিৎদের বসবাস। বাবা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন তিন ভাই-এর মধ্যে ছোট সুরজিৎ, মা মঞ্জু সর্দার এখনো বেঁচে আছেন। বড় দুই দাদা কাজ করলেও ছোট ভাই কোন পেশাগত কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সুরজিৎ অল্প কিছু

নেশা করতো। কয়েক বছর আগে একটা চুরির কেসে নরেন্দ্রপুর থানা তাকে আটক করে, পরে ছেড়েও দিয়েছিল। নেশার জন্য সে বছর দুয়েক আগে একটা রিহ্যাব সেন্টারে ১০/ ১২ দিনের মতো ভর্তি ছিল। ইদানিং নেশা করলেও, মাত্রা অনেক কমে গেছে।

সুরিজিৎ-এর দাদা সুব্রত সর্দার, নরেন্দ্রপুর থানা লক-আপে দেখা করতে গেলে দূর থেকে দেখিয়ে দেয় দালাল সঞ্জয়। ঐ সঞ্জয় মারফত তাঁর কাছে কুড়ি হাজার টাকা চাওয়া হয়। সঙ্গে-সঙ্গে তিন হাজার টাকা দেন এবং বাকি টাকা পরে দেবে, বলে জানান। তারপরও ভাই-এর সাথে কোন কথা বলতে দেওয়া হয়নি। পরের দিন থানা লক-আপে গেলে সুরজিৎ এর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি! তাকে কেন আটক করা হয়েছে; তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? কোন ধারায় মামলা হয়েছে? এ-সব প্রশ্নের কোনও উত্তর থানা থেকে পাওয়া যায়নি। কোনও কিছুই পরিবারকে জানানো হয় না।

পরিবারের অভিযোগঃ দালাল সঞ্জয়ের মাধ্যমে এসআই অর্ণব চক্রবর্তী ১৭ হাজার টাকা নিয়েছেন এবং দশ দিনের পিসি নেওয়ার পরে আরও টাকা চেয়ে বলে যে, ৪ দিনের মধ্যে তাকে জামিন করিয়ে দেবে। এবং আরও আট হাজার টাকা দরকার! কিন্তু তারপরেই সুরজিতকে প্রথমে সুভাষগ্রাম হাসপাতালে এবং পরে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। এবং বাঙ্গুর হসপিটালে শুক্রবার ২১ এপ্রিল,'২৩ ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সুভাষগ্রাম হাসপাতালে ভর্ত্তির সময় দাদা সুব্রত দেখা করতে গেলে সুরিজিত-এর কাছে গিয়ে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। ঈমাম বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্ত্তির সময়ও তাদের খবর দেয়া হয়নি। সুব্রত বলেন, সুরজিৎ যখন মারা যায় তারপর তাদের খবর দেওয়া হয়। এত কিছুর মধ্যে পরিবারের কাছ থেকে টাকা নিলেও, এই খবরগুলো তাদের জানানো হয়নি! পরিবারের পক্ষ থেকে বলে, লকআপে বা হাসপাতালে থাকার সময় সুরজিতের সঙ্গে কোনোভাবে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। বাঙুর হাসপাতাল থেকে তার দেহ পাওয়ার পর দেহের বিভিন্ন অংশে বিশেষতঃ শরীরের পেছনের অংশে, মাথায়, ডান চোখের পাশে ক্ষত চিহ্ন দেখা গেছে, এমনটাই সুকান্ত সর্দার জানান।

পর্যবেক্ষণ

১) সুরজিতের মা মঞ্জু সর্দার, দুই দাদা সহ পরিবারের লোকজন, বন্ধু স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায় যে, সুরজিৎকে পিটিয়েই মারা হয়েছে থানায়। মৃত্যুর অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

২) গ্রেফতারের সময় কোন কাষ্টডি মেমো দেওয়া হয়নি। কার্যতঃ থানা এই গ্রেপ্তারি বা তার পরবর্তী ঘটনায় কোন আইন মানেনি।

২৪ এপ্রিল, '২৩, এ পি ডি আর-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল সহ বারুইপুর পুলিশ জেলার এস পিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন, মৃত সুরজিৎ এর দুই দাদাকে।

প্রতিবেদন লেখার সময় খবর পাওয়া গেল আইও অর্ণব চক্রবর্তীকে ক্লোজ করা হয়েছে।

এ পি ডি আর-এর দাবি

১) অবিলম্বে সমগ্র বিষয়টা বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।
২) তদন্তের স্বার্থে অবিলম্বে নরেন্দ্রপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (IC), অভিযুক্ত আইও অর্ণব চক্রবর্তী এবং এই ঘটনায় যুক্ত সব পুলিশ কর্মীদের সাসপেন্ড করতে হবে।

৩) ক্ষতিপূরণ হিসাবে ন্যূনতম ৫০ লক্ষ টাকা মৃত সুরজিত-এর পরিবারকে দিতে হবে।

তথ্যানুসন্ধানে অংশগ্রহণকারী— গড়িয়া শাখা (রণজিৎ সাহা, কবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, পলাশ পাল, মধুসূদন সান্যাল, রঞ্জন দে, বাবলা মুখার্জি, আশীষ চাউলিয়া, নূরুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, দীপক খাটুয়া) দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, আলতাফ আমেদ

রাণাঘাট সাব-জেলে বন্দি মৃত্যু ।

১৮.০৩.২০২৩ রাণাঘাট সাব-ডিভিশনাল সংশোধনাগারে জয়দেব বর্মন নামে এক বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু ঘটে। বয়স ৬০ বছর। ২০১৮ সালের এক ডাকাতি মামলায় সন্দেহভাজন এক অভিযুক্ত হিসাবে তিনি গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে রয়েছেন রানাঘাট সংশোধনাগারে। জয়দেব বর্মনের বাড়ি নদিয়া জেলার খিসমা পঞ্চায়েতের ঝামালডাঙ্গা গ্রামে যা তাহেরপুর থানার অন্তর্গত। পেশায় তিনি ছিলেন একজন দিনমজুর, হতদরিদ্র পরিবার। ১৯ বছরের এক সন্তান রয়েছে নাম সুমন বর্মন, বগুলা কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। কন্যা সুমিতার বিবাহ হয়েছে, দিনমজুর টিপণ দাসের সাথে। জয়দেব

বর্মনের পাশের বাড়ির সাথে দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল এবং ওই বাড়িতেই ডাকাতির সূত্রে জয়দেব বর্মনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল যা এপিডিআর এর তথ্য অনুসন্ধানী দলের কাছে বিস্ময়জনক। বিচারাধীন বন্দি জয়দেব বর্মন শনিবার ১৮-৩-২৩, সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ অসুস্থতা বোধ করেন। সাড়ে সাতটা নাগাদ তাকে রানাঘাট আনুলিয়া হসপিটাল এ নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের লোক খবর পান বেলা বারোটার পর। স্ত্রী বাসন্তী বর্মনের বক্তব্য তার স্বামীর কোনো রকম শারীরিক অসুস্থতা ছিল না। বাসন্তী দেবী এই দীর্ঘ পাঁচ বছর লোকের বাড়ি কাজ করে সংসার চালিয়েছেন,ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছেন। আনুলিয়া হসপিটাল থেকে দেহ এনআরএস এ পাঠানো হয়। ২০-০৩-২৩ ময়নাতদন্ত হয়েছে।

বিচারের দীর্ঘ সুত্রতার কারণে জয়দেব বর্মন দোষী না নির্দোষ নির্ধারণ করা গেল না। পরিবারের বক্তব্য রাণাঘাট কোর্টে যে উকিল তাঁরা দিয়েছিলেন তিনি যথারীতি পয়সা নিয়ে গেছেন কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ার কি অবস্থা এবং জয়দেববাবু জামিন পাবেন কি পাবেন না সে বিষয়ে কিছুই তাদের জানানো হয়নি। এবং আরো ভয়ংকর অভিযোগ তারা করেন যে সাক্ষীদের যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা দাও তাহলে সাক্ষীরা তোমার স্বামীর পক্ষে কথা বলবে এবং তিনি বেকসুর খালাস পাবেন।

আমাদের দাবী

নিঃসন্দেহে এটি একটি হেফাজত মৃত্যু এবং সরকারি ঘোষণা অনুসারে অন্তর্বর্তী তিন লক্ষ টাকারক্ষতিপূরণ ওই পরিবারের সদস্যদের দিতে হবে।

কৃষ্ণনগর শাখার এই তথ্য অনুসন্ধানী দলে ছিলেন তাপস চক্রবর্তী , কিশোর সিংহ রায় এবং তাহেরপুরের সঞ্জয় দেবনাথ।

নদিয়া জেলার রাণাঘাটে আক্রান্ত নাট্যকর্মী তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

গত ৯ এপ্রিল,'২৩ তারিখ রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ রাণাঘাটে নিজের বাড়ীতে আক্রান্ত হলেন রানাঘাট 'সৃজক' নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা নিরুপম ভট্টাচার্য। ১১ এপ্রিল, '২৩ তারিখ এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে যায়। আমরা জানতে পারি, ঐ দিন রাত সাড়ে এগারোটায় তার বাড়িতে তৃণমূল আশ্রিত কয়েকজন দুষ্কৃতী প্রথমে কথা বলার অজুহাতে ঢোকে এবং তারপর তাকে নাটক সম্পর্কে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। জিজ্ঞাসাবাদ চলতে চলতে নিরুপমকে তারা বলতে থাকে রাণাঘাটে থেকে এসব নাটক করা যাবে না।

বিপ্লবী কবি ও সাহিত্যিক ভারভারা রাও রচিত 'কসাই' কবিতা অবলম্বনে রচিত নাটক 'কসাই' নাটকটি নিরুপম ভট্টাচার্যের উদ্যোগে পরিবেশন করেছিল 'সৃজক' নাট্যদল। শুধু এইটুকুই ছিল নিরুপমের 'অপরাধ ! এই নাটকে যেখানে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কথা তুলে ধরা হয়েছে সেখানেই ভয় ধরে গেছে রাণাঘাটের শাসকদলের দুষ্কৃতিদের। রাত সাড়ে এগারোটা থেকে প্রায় রাত দুটো অব্দি চলে হুমকি আর মারধর। আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি নিরুপমের ছিয়াত্তর বছর বয়সী বাবা নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তার মা ও স্ত্রী এই ঘটনায় ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। পাশাপাশি তাকে এই হুমকি দেয় যে, নাটকের রিহার্সাল অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, নাটকের পরিবর্তে তিনি যেন হনুমান পূজো করেন। নিরুপম ১০ এপ্রিল '২৩ তারিখ সকালে থানায় অভিযোগ জানালে সেই অভিযোগ থানা গ্রহণ করে না।

১১ এপ্রিল,'২৩ তারিখ তথ্যানুসন্ধানের পর এপিডিআর কৃষ্ণনগর শাখা ও অন্যান্য নাট্যদলের কর্মীরা থানায় যায় এবং বাদ-অনুবাদের পর, অবশেষে একটি জি ডি (GD NO. 589 dated 10.04.23) হয়। জিডি ১১ তারিখ দায়ের হলেও দিন দেওয়া হয় ১০-০৪-২৩।

নাট্যকর্মীর ওপর এই আক্রমণ চলছে সারা রাজ্যজুড়ে। মূল ধারার নাট্য সংস্কৃতির বদলে ভিন্নমতের নাট্যদল-কর্মীর ওপর এই আক্রমণ আসলে ভিন্নমতের অধিকারের ওপর আক্রমণ। এপিডি আর কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে ঐ দিন ই প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। অবিলম্বে এই ঘটনার সাথে যুক্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত তদন্ত শুরু করার দাবি জানায় ।

তথ্যানুসন্ধান দলে ছিলেন— দেবাশীষ নন্দী ও মৌতুলি নাগ সরকার।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

রিপোর্ট— কৃষ্ণনগর শাখা

বার্ষিক সাধারণ সভা সফল করতে কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে পোস্টারিং করা হয় কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন এলাকায়। ফারাক্কায় আদানি প্রকল্প এবং সারা দেশ জুড়ে জল জঙ্গল জমির ওপর কর্পোরেট লুঠের বিরোধিতায় পোস্টারিং করা হয়।

১৬ এপ্রিল, '২৩ কৃষ্ণনগর শাখার (দ্বাদশ দ্বি বার্ষিক) ২৬ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গঠিত হয় নতুন শাখা কমিটি ।তুষারেন্দ্র ভট্টাচার্য ও মৌতুলি নাগ সরকার যথাক্রমে শাখা সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। সহ সম্পাদক-দেবাশীষ নন্দী ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হন ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ও অমিতাভ সেনগুপ্ত। মোট ৩১ জন সদস্যের উপস্থিতিতে এই সম্মেলন সফল হয়।

রিপোর্ট— কালনা-সমুদ্রগড় শাখা

এ পি ডি আর-এর বার্ষিক সভাকে সামনে রেখে ২০ এপ্রিল, '২৩ পথ সাভার আয়োজন করে কালনা- সমুদ্রগড় শাখা এবং নবদ্বীপ প্রস্তুতি কমিটি । বিদ্যানগর-এ (কালিতলা বাজার) এই পথ সভা হয়। বিষয় ছিল, ১) জল জমি জঙ্গল এর উপর কর্পোরেট লুট এর বিরুদ্ধে, ২) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্থ মুক্তি, ৩) লক ডাউন পরবর্তী তে তাঁত শ্রমিক, তাঁতি, দের অর্ধাহারে থাকা, আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটে যাওয়া নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য সরকার এর ভূমিকা। এছাড়াও চেতনা মঞ্চর পক্ষ থেকে আসাম এর ডিটেনশন ক্যাম্পের একটা ঘটনা নিয়েএকটা ২০ মিনিটের নাটক মঞ্চস্থ হয়।

রিপোর্ট— বিজপুর শাখা

বীজপুর শাখার উদ্যোগে ৩১ মার্চ,২৩ থেকে ২ এপ্রিল, '২৩ এই তিন দিন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হালিশহরে লিটিল ম্যাগাজিন মেলায় এ পি ডি আর-এর প্রকাশনা নিয়ে একটি বই-এর স্টল দেওয়া হয়। কৃষ্ণনগর শাখা এবং নৈহাটি শাখা বই-এর স্টলে সহযোগিতা করে।

রিপোর্ট— মালদা শাখা

মালদা শাখার পরবর্তী দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের দিন ঠিক হয়েছে আগামী ৩০ এপ্রিল। মালদা শহরের অতুল মার্কেটে অবস্থিত এ পি ডি আর কার্যালয়ে বিকাল চারটে থেকে শুরু হবে এই দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনের প্রচার প্রস্তুতিতে ২১ এপ্রিল সন্ধ্যা ছয়টা থেকে মালদা শহরের রাজ হোটেল মোড়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে 'আক্রান্ত মানবাধিকার' এই বিষয়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আগে এই বিষয়ে শহরের আর এক প্রান্তে আরও একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে সদস্য পুনর্নবীকরণ এবং নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজ।

এ পি ডি আর, মালদা শাখার পক্ষ থেকে গত মার্চ মাসে দুইটি চলচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। এ পি ডি আর মালদা শাখার নিজস্ব প্রজেক্টর এর সাহায্যে এপিডিআর কার্যালয়ে গত ৫ মার্চ তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ৩১ মার্চ প্রদর্শিত হয় আরও একটি তথ্যচিত্র। এই চলচিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানে এ পি ডি আর-এর সদস্য ছাড়াও কিছু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং এ পি ডি আর-এর এই উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। উপস্থিত দর্শকদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে এধরনের আরও প্রদর্শনের আবেদন জানান।

রিপোর্ট— হুগলী জেলা কমিটি ও শাখাগুলির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

২৫/০১/২৩ ভাবাদিঘী গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা।

০৫/০৩/২০২৩ চুঁচুড়া শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা।

০৯/০৩/২০২৩ দশঘড়ায় হিমঘর থেকে গ্যাস লিক করে স্থানীয় মানুষের দুর্দশার তথ্যানুসন্ধান।

১০/০৩/২০২৩ দাদপুর থানা এলাকায় ডাইনি সন্দেহ করে এক দম্পতির হেনস্থার তথ্যানুসন্ধান।

১৭/০৩/২০২৩ দশঘড়ায় হিমঘর থেকে গ্যাস লিকের বিষয়ে আসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, এগ্রিকালচারালাল মার্কেটিং, হুগলী-র সাথে সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনা।

১৯/০৩/২০২৩ শ্রীরামপুর শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা।

২৬/০৩/২০২৩ চন্দননগর শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা।

০৩-০৪/০৪/২০২৩ রিষড়ায় রামনবমী উপলক্ষে মিছিল নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি এবং তজ্জনিত পরিস্থিতির তথ্যানুসন্ধান।

০৭/০৪/২০২৩ রিষড়ায় রিষড়ায় রামনবমী উপলক্ষে মিছিল নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি এবং তজ্জনিত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নাগরিক উদ্যোগে প্রচারপত্র বিতরণে শ্রীরামপুর শাখার

অংশগ্রহণ।

০৭-০৮/০৪/২০২৩ চুঁচুড়া লিটিল ম্যাগাজিন মেলায় চুঁচুড়া শাখার।

০৮/০৪/২০২৩ বাঁশবেড়িয়া-ত্রিবেণী শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা।

১৮/০৪/২০২৩ চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে জেলা কমিটির পথসভা।

২৩/০৪/২০২৩ হুগলী জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা।

রিপোর্ট—APDR, বেলঘড়িয়া শাখা

দীর্ঘ অচলাবস্থা র পর এপিডিআর বেলঘরিয়া -নিমতা শাখার সভাপতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে প্রায় ১৫ দিনের অগ্রিম নোটিশ দিয়ে শাখার সমস্ত সদস্যদের কাছে সশরীরে পৌঁছে সমিতিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন। সিদ্ধান্ত মত সমিতির শাখার ২৫ জন সদস্যকে দিয়ে ঐ নোটিশের কপিতে সই করা হয়।

অবশেষে গত ২৫ শে মার্চ ২০২৩, বেলঘরিয়া স্টেশন সংলগ্ন বেস্ট ফ্রেন্ড ক্লাব (সন্দীপ দত্ত ভবনে), শিবানী সেন মঞ্চে শাখার অষ্টাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সমিতির ১৩ জন সদস্য / সদস্যার উপস্থিতিতে ১৫ জন সদস্যের সদস্যপদ নবীকরণ করা হয়। সভায় শাখার সাংগঠনিক প্রতিবেদনের উপর সংগঠনের ৮ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নানান বিতর্কগুলিকে নানা দিক থেকে পর্যালোচনা করে দ্রুত সংগঠনকে সক্রিয় করতে বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ লিপিবদ্ধ হয়। অবশেষে ৭ সদস্যের একটি কর্যকরি কমিটি গৃহীত হয়। শাখার উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।

সভাপতি- অসীম দে, সহ- সভাপতি- বরুন দাস , সম্পাদক- শঙ্কর দাস, সহ-সম্পাদক- দুলাল দে, কোষাধক্ষ- অর্চনা মিত্র (দেবী দি), সায়নি সেন ও শিশির দত্ত, কাউন্সিল মেম্বার... অর্চনা মিত্র।

সভার সভাপতিত্ব করেন অসীম দে . কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির দুই সহ সভাপতি বাপী সেনগুপ্ত ও সঞ্জীব আচার্য।

সম্মেলন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে আমরা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সাম্প্রতিক নানা বিষয়ের উপর পোষ্টার লাগানো হয়। ১৬ ই এপ্রিল ২০২৩ , বেলঘরিয়া বাটার মোড়ে সমিতির দক্ষিণ বঙ্গ বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে কেন্দ্রীয় পোষ্টার লাগানো ও একটা প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করা হয়। তীব্র দাবদাহ, ঈদের আবহের জন্য শাখার সদস্যদের উপস্থিতি একটু কম হলেও সভায় বক্তাদের বক্তব্য ও বিষয় নির্বাচন যথেষ্ট সাড়া ফেলে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখার সাংগঠনিক রিপোর্ট

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখা ধারাবাহিক ভাবে মানবাধিকার রক্ষা ও পরিবেশ রক্ষার পক্ষে আন্দোলন ও প্রচারের কর্মসূচি সংগঠিত করে চলেছে। গত ৮ এপ্রিল সোনারপুরের হরিনাভি অঞ্চলে (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখার উদ্যোগে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। পথসভাটির ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও শিক্ষায় গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে এবং গাছ ও জলাভূমি রক্ষার দাবিতে।

এই পথসভায় বক্তব্য রাখেন (এ পি ডি আর) দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষে জেলা সম্পাদক আলতাফ আহমেদ এবং তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের সাম্প্রতিক কর্মচারী আন্দোলন এবং বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের লাগাতার ধর্না ও আন্দোলনের ওপর নেমে আসা রাজ্য সরকারের ঘৃণ্য পুলিশি আক্রমণের কথা তুলে ধরেন। জেলা সভাপতিও এই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দ্বারা মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের অধিকার লঙ্ঘনের তীব্র সমালোচনা করেন। পথসভায় শাখা সম্পাদক জগদীশ সর্দার রাজ্যের মানবাধিকার লঙ্ঘনের করুণ চিত্রটি তুলে ধরার পাশাপাশি সোনারপুর-রাজপুর এলাকায় প্রশাসনের মদতে পরিবেশ ধ্বংস, জলাভূমি ভরাট এবং গাছ কাটার কথা তুলে ধরেন। শাখার অন্যতম সদস্য প্রসূন তুলে ধরেন রাজ্যের কারাগারগুলিতে বন্দিদের ওপর হয়ে চলা নিদারুণ রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কাহিনী। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তিনি তুলে ধরেন। এছাড়া সোনারপুর থানার এলাকার অপরাধ দমনে উদ্দেশ্যমূলক নিষ্ক্রিয়তার কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। শাখার অপর সদস্য সরোজ বসু ধর্মান্ধতা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাঁর সঞ্চালনায় পথসভাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং এলাকার জনগণকে আকৃষ্ট করে। এপিডিআর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শঙ্কর দাস তুলে ধরেন সামপ্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্বর। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে কর্মহীন ভারতের কথা। সম্প্রীতির কথা। পুলিশি

নিষ্ক্রিয়তার কথা। পুলিশ সাধারণ মানুষের অভিযোগ না নেবার কথাও। দেবাশিস ভট্টাচার্য সহ শাখার আরও বেশ কিছু সদস্য পথসভায় তাঁদের বক্তব্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, হিন্দুত্ববাদ, শিক্ষার গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে এবং গাছ ও জলাভূমি রক্ষার দাবি তুলে ধরেন।

এই পথসভাটি ছাড়াও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখা সোনারপুর থানার নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত অঞ্চল জুড়ে পোস্টার ও প্রচার কর্মসূচি চালিয়েছে। শাখার সাম্প্রতিক পোস্টারের দাবিগুলি ছিল— সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তি চাই, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশি অভিযান বন্ধ করতে হবে, জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করা চলবে না, ন্যায্য মহার্ঘভাতা ও শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে, শিক্ষক ও কর্মচারীদের, শান্তিপূর্ণ অনশন আন্দোলন ও অবস্থানের উপর, শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী ও রাজ্য প্রশাসনের হুমকি ও পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, সোনারপুর-রাজপুর অঞ্চলে জমি-হাঙর ও প্রমোটার চক্রের দ্বারা ব্যাপকভাবে জলাভূমি ভরাট ও গাছপালা কেটে সবুজ ধ্বংস রুখতে স্থানীয় প্রশাসন ও পৌরসভাকে উপযুক্ত ব্যাবস্থা নিতে হবে।

এই দাবিগুলির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখা আগামিদিনেও আন্দোলন ও প্রচার কর্মসূচি নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

রিপোর্ট— হুগলী জেলার রিষড়া অঞ্চলে রাম নবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে করে বিপজ্জনক পরিস্থিতি

গত ৪ ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার APDR এর পক্ষ থেকে সঞ্জীব আচার্য এবং অরিজিৎ গাঙ্গুলী আ সকাল ৯টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত সন্ধ্যাবাজার, RK road, Gandhi road, Champa road ঘুরে কয়েকজনের সাথে কথা বলেন। এলাকায় মানুষ সন্ত্রস্ত।পরিস্থিতির উন্নতি দরকার। চাপা উত্তেজনা, আশঙ্কা ও গুজব বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি করেছে। একটা উদ্যোগ সম্ভাব্য সকলকে নিয়ে সম্প্রীতির পক্ষে এলাকায় প্রচারের জন্য খুব দরকার।

এলাকায় মানুষের সাথে কথা বলার সময় বোঝা যাচ্ছে মানুষ ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে। যা প্রধান বিরোধী দল চাইছে। শাসক দল এই ব্যাপারটিকে প্রতিহত করতে চাইছে এমন মনে হলো না। মিছিলের সময় কিংবা তার পরেও পরিস্থিতি সামলানোর জন্য শাসক দলের কোনো তৎপরতা নেই বলেই এলাকার মানুষ ক্ষোভের সাথে জানিয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই রাম নবমীর মিছিলের প্রস্তুতি চোখে পড়ার মতো। রমজান মাসে রোজা ভাঙার সময়, নামাজের সময় অস্ত্রে সজ্জিত রাজনৈতিক নেতা শোভিত মিছিল মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া আর আগুন নিয়ে খেলার মধ্যে তফাৎ কত টুকু? তবু পুলিশ অনুমতি দিলো! শুধু অনুমতি দিলো তাই নয়, উস্কানি থেকে অশান্তি হলে সামলানোর জন্য যে বাহিনী রাখা দরকার ছিলো তাও রাখলো না। IB'র সতর্কতা সত্বেও ২০-৩০ জনের একটা বাহিনী এই মিছিল সামলাবে! পুলিশ ও আহত হয়েছে। তারাও ক্ষুব্ধ। মিছিল ঘিরে অশান্তি এড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষ তার মতো করে ছোট ছোট উদ্যোগ নিয়েছে। মিছিলের লোকজনকে সরবত দেওয়া, মিছিলের একটা অংশকে নিজেদের এলাকায় পাহারা দিয়ে পার করিয়ে মূল মিছিলের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করা। তা'তেও শেষ রক্ষা হয় নি। কারণ রাজনীতির গন্তব্য কবেই বা সাধারণ মানুষের কথা ভেবে হয়!

মসজিদ সংলগ্ন মানুষের ভাষ্য অনুযায়ী ভাগে ভাগে মিছিল মসজিদের পাশ দিয়ে গেছে। ধর্মীয় মিছিলে স্লোগান ছিলো রাজনীতির। গেরুয়া রাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। দিলীপ ঘোষের সাথে মিছিলের যে অংশ আসছিল তারা মসজিদের সামনে থমকে যায়। আধঘন্টা দাড়িয়ে থাকে। ডি জে র প্রবল শব্দ স্লোগান মিলে উত্তেজক পরিস্থিতি। মিছিল কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ উড়িয়ে দিয়ে মিছিল দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর শুরু হয় অশান্তি পর্ব। শুরু হয় পাথর ছোঁড়া দিয়ে। দু'পক্ষেই পাথর ছোঁড়া হয়েছে বলে সবাই স্বীকার করেছে। কা'রা প্রথম পাথর ছুঁড়েছে তা' নিয়ে দুটি বিপরীতধর্মী বয়ান পাওয়া গেছে। একটা অংশের বক্তব্য যে দিলীপ ঘোষের সাথে থাকা তিনটি গাড়ি থেকেই প্রথম পাথর ছোঁড়া হয় মসজিদ লক্ষ্য করে। অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদের ইমাম আহত হয়েছে বলে তারা জানান। এরপর দুপক্ষের তরফেই পাথর ছোঁড়া হয়। বাইকে আসীন কয়েকজন এলাকার মানুষকে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে। কয়েকটি বাইক ভাংচুর হয়। উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকটি দোকান ভাংচুর হয়। পাথরের ঘায়ে আহত হন দু' পক্ষেই। পুলিশ ও আহত হয়েছে। পুরশুড়া বিধায়ক মিছিলে ছিলেন। তিনি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বলে একজন জানান। মিছিলের সাথে থাকা গাড়িতে পাথর কেন ছিলো সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কেউ কেউ। অন্যদিকে আরেকটি অংশের মত পাথর প্রথমে মিছিলের উপর ছোঁড়া হয়। তারপর যা ঘটে সেটা প্রতিক্রিয়া।

এদিনের ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বেশ কিছু মানুষ জানান, গতকাল রাতে সংখ্যালঘুদের উপর একটা বড় আক্রমণের প্রস্তুতি ছিল। পুলিশ তৎপর হয়ে প্রতিরোধ তৈরি করে। এই কারণে চার নাম্বার রেল গেটের কাছে গত সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ওই অঞ্চলে পুলিশের সাথে খন্ড যুদ্ধ চলে। ব্যাপক বোমাবাজি হয়। ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ পরিস্থিতি আয়ত্বে আনে। এলাকায় কয়েকজন পুলিশের এই ভূমিকার প্রশংসা করেন। তারাই বলেন পুলিশ এই দায়িত্ববোধ রবিবার দেখালে এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না। এলাকা থমথমে। মানুষ নিজেরাই রাতপাহারা দিচ্ছেন সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করতে। মঙ্গলবার ভোর রাতে দেড়টা নাগাদ প্রায় সত্তর জনের একটি দল বাগখাল এলাকায় মুসলিম বস্তিতে পৌঁছে যায়। কিন্তু রাত পাহারা ও প্রশাসন সক্রিয় থাকায় অপ্রীতিকর অবস্থা এড়ানো গেছে। আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। অধিকাংশ দোকান বন্ধ। কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

এরই মধ্যে আশার আলো যে, খটির বাজার থেকে চম্পা রোড মধ্যবর্তী একটি পাড়ায় (পি কে দাস লেন, রিষড়া) উভয় ধর্মের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করে যে কোন আক্রমণ এলে পরস্পরকে সহযোগিতা ও রক্ষার শপথ নিয়েছেন। এই আলো অন্যত্র ছড়িয়ে দেওয়া খুব প্রয়োজন। প্রশাসন কে রাজনৈতিক চাপ উপেক্ষা করে অবিলম্বে এলাকায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে সম্প্রীতির সাথে থাকতে পারেন তা' নিশ্চিত করতে হবে। দুষ্কৃতী বা অশান্তি সৃষ্টির যে কোন চেষ্টাকে বাধা দিতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় বা রাজনীতির রং দেখে পক্ষপাত বন্ধ করতে হবে। জনজীবন স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করতে হবে।

রিপোর্ট— মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৯শে মার্চ, ২০২৩ দুপুর ৩টে থেকে সংগঠনের দৌলতাবাদ শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত প্রতিনিধিদের সংখ্যা একটু কম থাকলেও যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলের আলোচনায় অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মত। প্রথমেই সভাপতি হামিদ সরকারের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। সম্পাদক আনারুল শেখ প্রতিবেদন পাঠ করে। প্রতিবেদনে মূলত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনগণের অধিকারের ওপর আক্রমণের চিত্রটি উঠে আসে। উঠে আসে, সাংগঠনিক অবস্থার কথা।

উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যই প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা করে এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করে। তাদের কথার মধ্যে মূলত উঠে আসে বিজেপি আরএসএস দ্বারা পরিচালিত সরকারের সংবিধানিক রীতিনীতিকে কাঁচকলা দেখিয়ে জনগণের একের পর এক অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা। সমস্ত সংখ্যালঘু অধিকারের ওপর আক্রমণের কথা। বিএসএফ ও এনআইএ'র অত্যাচারের কথা। উঠে আসে গোটা রাজ্য জুড়ে পুলিশের জনগণের অধিকারের ওপর নির্মম আক্রমণের কথা। গণআন্দোলন, মিটিং, মিছিলের ওপর রাজ্য পুলিশের হামলার কথা। প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনের পর সামগ্রিকভাবে শাখার সমস্ত সদস্য প্রতিবেদনকে সমর্থন করে। কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক গোলাম মোঃ আজাদ দৌলতাবাদ শাখার বার্ষিক সাধারণ সভাটিতে উপস্থিত ছিল।

রিপোর্ট—মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা শাখার প্রতিবাদ সভা, পোস্টার প্রদর্শন ও প্রচারপত্র বিলি

গত ২১ শে মার্চ, ২০২৩ এপিডিআর বেলডাঙা শাখার আহ্বানে, ফারাক্কার কৃষকের অসম্মতিতে আম-লিচু বাগান ধ্বংস করে আদানি কোম্পানির চার লক্ষ ভোল্টের তার নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে, সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষকের ওপর বিএসএফের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের জন্য মোড়ের কৃষকদের ওপর চাপানো মিথ্যে মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে, বেলডাঙার পাঁচরাহার মোড়ে একটি প্রতিবাদী সভা, পোস্টার প্রদর্শন ও প্রচার পত্র বিলি হয়।

এই সভায় বক্তব্য রাখেন, বেলডাঙ্গা শাখা সম্পাদক করিম বক্স, আসবার আলী সহ অনেকে। সভায়, খালি গলায় স্লোগানের তীক্ষ্ণতা খুবই দ্রুত এলাকার মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। সভাটিকে ঘিরে চারপাশে এলাকার মানুষ জড়ো হয়ে যায়। নিমিষের মধ্যে ব্যাপক প্রচারপত্র বিলি হয়। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলার দরুণ সভাটি খালি গলায় হয়। কিন্তু, সভাটিকে ঘিরে এলাকার মানুষের জমে যাওয়া ছিল সত্যিই অভূতপূর্ব। সভাস্থল ঘিরে রাস্তায় জ্যাম তৈরি হয়ে যায়। মাইক ছাড়াও কোন সভা করে এত মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরে বেলডাঙা শাখার সদস্যদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্যিই ছিল দেখবার মত।

রিপোর্ট—মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৩শে এপ্রিল ২০২৩ বহরমপুরের ব্রীহি সাংস্কৃতিক সংস্থার ঘরে দুপুর একটা থেকে বহরমপুর শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচন্ড গরমের জন্য ও বয়সজনিত কিছু অসুবিধার কারণে বহরমপুর শাখার কিছু সদস্য এই বার্ষিক সাধারণ সভায় আসতে পারেননি। এছাড়াও সংগঠনকে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত যে ভাঙার প্রক্রিয়া চলছে, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেও ২ জন এই বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দেয়নি।

শাখার সভাপতি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অনুপস্থিত থাকার দরুণ সংগঠনের বহরমপুর শাখা ও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (শাখার বর্তমান কার্যকরী কমিটির সদস্য) নিরঞ্জন চক্রবর্তী শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনার জন্য সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। প্রথম এক মিনিট শহীদ স্মরণের পর সভার কাজ শুরু হয়। প্রতিবেদন পাঠ করেন বর্তমান শাখা সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী। প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সারা পৃথিবীর জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধাবস্থার কথা আলোচিত হয়। দেশ, রাজ্য, জেলা ও বহরমপুর শহরের প্রেক্ষিতে বর্তমান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী সরকার গুলি জনগণের অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা প্রতিবেদনে বারংবার উল্লেখিত হয়।

সভাপতি, সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যকে প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার জন্য আহ্বান রাখেন। প্রায় প্রত্যেক সদস্যই প্রতিবেদনের ওপর স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা করেন, সংযোজন বিয়োজন করেন ও বিশেষত সংগঠনের এই ভাঙ্গন অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীকে শক্তিশালী করার ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী স্বীকৃত মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সাথে থাকার বিষয়েই জোর দেন। সভায় উপস্থিত সদস্যের মধ্যে একজন অবশ্য কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী দ্বারা অস্বীকৃত জেলা কমিটির সাথেই বহরমপুর শাখা থাকার কথা বলেন। যদিও তিনি নির্দিষ্টভাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সাথেই বহরমপুর শাখা থাকার বিষয়টি অত্যন্ত জোড়ের সাথে বলেন। প্রতিবেদনের সার্বিক দিকটা নিয়ে আলোচনার বদলে আলোচনাটা মূলত কেন্দ্রীভূত হয় প্রতিবেদনে উল্লেখিত শাখার সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে।

এরপর বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্যের জনগণের অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নানা রূপের কথা আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সহ সভাপতি তাপস চক্রবর্তী। তিনি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে মূলত কৃষ্ণনগর সম্মেলনের পর থেকে সংগঠনের মধ্যে যে ভাঙ্গন রেখাটি সুস্পষ্ট ভাবে সামনে উঠে এসেছে তার কার্য, কারণ ও সম্পর্ক নিয়েই মূলত আলোকপাত করেন। কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য হিসাবে সভায় উপস্থিত গোলাম মোহাম্মদ আজাদ মূলত ডোমকল সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলা মন্ডলীর গঠন ও কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির গঠনকে স্বীকৃতি দান, এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

শাখা সম্পাদকের জবাবী ভাষনের পর বহরমপুর শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা সাংগঠনিক প্রশ্নে নিম্নলিখিত দুটি বিশেষ সিদ্ধান্ত নেয়।

১. বহরমপুর শাখা সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সাথেই আছে ও সংগঠনকে ভাঙার কোন কাজের সাথেই বহরমপুর শাখার কোন সদস্য থাকবে না।

২. বহরমপুর শাখা কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী দ্বারা স্বীকৃত মুশিদাবাদ জেলা কমিটির সাথেই থাকবে। কিন্তু যেসব সদস্য এই জেলা কমিটির বিরুদ্ধে গিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী দ্বারা অস্বীকৃত ও অবৈধ জেলা কমিটির সাথে আছেন, বিশেষত বহরমপুর শাখার সদস্য, তাঁদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে জেলা ঐক্যকে শক্তিশালী করার জন্য এই বার্ষিক সাধারণ সভা শাখার তিনজন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এরপর সভাপতি ৩০ এপ্রিল ২০২৩ কলকাতা রামমোহন লাইব্রেরী হলে এপিডিআর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর বার্ষিক সাধারণ সভায় শাখার সকলকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়ে বহরমপুর শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ করেন।

রিপোর্ট—এ পি ডি আর-এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচী

১৫ মার্চ, ২০২৩, রাষ্ট্রের পুঁজিবাদ তোষণের ফলে লুণ্ঠিত সংবিধান স্বীকৃত অধিকার রক্ষার আন্দোলনে শ্রমজীবী নারী সংগঠন ও শ্রমজীবী নারী শ্রমিকদের কথা শুনতে এপিডিআর বৌবাজার ভারতসভা হলে 'শ্রমজীবী নারী শ্রমিক দিবস' উদযাপন করে। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত নারী শ্রমিক ও সংগঠন তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন এই সভায়।

৬ এপ্রিল ২০২৩, সাম্প্রদায়িক উস্কানী ও বিভেদের ফসল তোলা রাজনীতি বন্ধের দাবিতে পথসভা হয় বৌবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া র সামনে।

১৩ এপ্রিল ও ২৮ এপ্রিল ২০২৩ বর্তমান পরিস্থিতিতে

যৌথ আন্দোলন এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ক্ষুব্জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের যুদ্ধক্ষ্ম বন্ধের দাবিতে গণ আজাদ মোর্চা ও অন্যান্য গণ সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে পথ সভায় সামিল হয় এপিডিআর এর কর্মীরা।

৫ মার্চ, '২৩ যশোর রোডের গাছ বাঁচাও আন্দোলনের সাধারণ সভায় এপিডিআর এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত হয়ে এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। এই আন্দোলনে সর্বতোভাবে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সোমনাথ বসু। পরবর্তী কর্মসূচি ২৫ মার্চ, '২৩ সাংবাদিক সম্মেলন ও মানব বন্ধন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন বহু সদস্য। আন্দোলনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ২৫ এপ্রিল, '২৩ বারাসাত রেল স্টেশনে জমায়েত ও মিছিল করে তিন দফা দাবিতে জেলাশাসক দপ্তর অভিযান কর্মসূচিতেও যোগ দেয় সদস্যরা।

রিপোর্ট—APDR যাদবপুর বাঘাযতীন শাখার (প্রস্তুতি কমিটি)

আধার কার্ড ও প্যান কার্ডের বাধ্যতামূলক সংযুক্তির বিরুদ্ধে জোড়া কর্মসূচি

ভারতে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়, প্যান কার্ডও পঞ্চাশ হাজার টাকার নিচের লেনদেনে বাধ্যতামূলক নয়। তবে কেন আধার-প্যান লিঙ্ক বাধ্যতামূলক করা হবে? ২০১৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এ-ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে বলা হয়েছিল আধার কার্ড প্যান কার্ড লিঙ্ক শুধুমাত্র ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক। ভারতে মাত্র আট কোটি মানুষ ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় পড়ে। তবে কেন সমস্ত নাগরিকদের উপর এই নির্দেশিকা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? আধার প্যান লিঙ্কের জন্য সাধারণ মানুষের থেকে ফাইনের নামে মাথাপিছু ১০০০ টাকা করে লুঠ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই যা চার হাজার কোটি টাকায় পৌছেছে। এই বিশাল টাকার অঙ্ক কোন খাতে খরচ হবে তারও কোন সঠিক নিদান পাওয়া যায়নি। শেষ তিন চার বছরে দ্রব্যমূল্য প্রায় একশো শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, এমতো অবস্থায় এই বাড়তি বোঝা কেন্দ্র দেশের সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী ৩০ জুনের মধ্যে আধার-প্যান লিঙ্ক না করালে প্যান কার্ড অচল হয়ে যাবে এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন হুঁশিয়ারি জারি করেছেন সময়সীমা পেরিয়ে গেলে ফাইনের অঙ্ক আরও বাড়বে। গত ২৮ মার্চ মঙ্গলবার ঙ্গঞ্জঙ্গট্র যাদবপুর বাঘাযতীন শাখার (প্রস্তুতি কমিটি) পক্ষ থেকে অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্যান আধার সংযুক্তির কাজ বন্ধের দাবি সহ চার দফা দাবিতে আয়কর ভবন দক্ষিণ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। যাদবপুর থানার সামনে থাকে এই মিছিল শুরু হয় চলে আয়কর ভবন দক্ষিণ পর্যন্ত। মিছিল শেষে আয়কর ভবন দক্ষিণের ডেপুটি অফিসারের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের চার দফা দাবি গুলো ছিল

১) অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্যান আধার সংযুক্তির কাজ বন্ধ করতে হবে।

২) এ যাবৎ সংযুক্তি বাবদ নেওয়া সব টাকা ফেরৎ দিতে হবে।

৩) সংযুক্তির নামে সাধারণ মানুষের ব্যক্তি পরিসরে নজরদারি করা চলবে না।

৪) সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী আধার কার্ড বাধ্যতামূলক নয় তাহলে সংযুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক হয় কী করে ? বেআইনি কাজ বন্ধ কর।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার আশ্বস্ত করেন যে তিনি এই ডেপুটেশন কপি তার উচ্চ পদস্ত আফিসারের কাছে হস্তান্তর করবে। যাদবপুর-বাঘাযতীন শাখা (প্রস্তুতি কমিটি) পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে, এই বিষয়ে মানুষের মধ্যে জনমত গড়ে তোলার লক্ষে গত ১০ এপ্রিল যাদবপুর এইট-বি বাস স্যান্ডে একটি পথসভার আয়োজন করে। পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে ফুটপাতের দোকানদার বা ভ্যান-রিক্সা চালকদের চোখে ধরা পরে ক্ষোভ। কেন্দ্রীয় সরকারে মোদি-রাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই কখনো নোট বদলির বাহানায়, কখনো আধার কার্ডের নামে, কখনো নাগরিকত্বের নামে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল করে একের পর এক কার্ডের লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সাধারণ মানুষের লাইনে দাড়ানো যেন শেষই হচ্ছে না। আধার এবং প্যান লিঙ্কের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিটা মূহুর্তে আপনার গতিবিধিকে নজরে রাখতে চাইছে। আপনার কোথায় কি গচ্ছিত সঞ্চিত আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ একটা ক্লিকের মাধ্যমেই বের করে ফেলা সম্ভব। সম্ভব হবে আপনার যাবতীয় খরচাপাতির বিষয়ে নজরদারি। কারণ ইতিমধ্যেই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আধারে সংযুক্ত। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, ব্যক্তি পরিসর বলে আর কিছুই থাকছে না। অথচ বড় বড় ব্যবসায়ী, কর্পোরেট সংস্থা গুলো তাদের টাকা বিদেশি ব্যাঙ্কে

— বাকি অংশ ২ পাতায়